শাশ্বত ভারত

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়



দি ঢাকা ষ্টুডেন্টস লাইব্রেরী
(স্থাপিত ১৮৭৭ খৃঃ)
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
৫ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট; কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :

রথযাত্রা

১২ই জুলাই, ১৯৫২

প্রকাশক :

শ্রীরামদাস দত্ত

৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদ শিল্পী :

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :

শ্রীরঞ্জিতকুমার দত্ত বি. এস্-সি

তোলাগিরি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১১১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

কল্যাণীয়া

শ্রীমতী সুধা চট্টোপাধ্যায়

সুচরিতাসু-

প্রাক্-কথন

কঠোপনিষদের ঋষি বলেছেন—

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্' ॥

বহু শাস্ত্রাভ্যাসের দ্বারা, মেধার দ্বারা বা বহু শ্রবণের দ্বারা আত্মাকে লাভ করা যায় না। পরমাত্মা যে সাধককে অনুগ্রহ করেন, শুধু তিনিই তাঁকে জানতে পারেন, আর সেই অনুগৃহীত ব্যক্তির নিকটই পরমাত্মা নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন।

এ ব্যাখ্যা অবশ্য ভক্তিবাদী আচার্যগণের সম্মত। তাঁরা বলেন— জ্ঞানীর নিকট যিনি ব্রহ্ম, যোগীর নিকট যিনি পরমাত্মা, ভক্তের নিকট তিনিই ভগবান। ভগবান যে সাধককে অনুগ্রহ বা কৃপা করেন, তিনিই তাঁকে জানেন। আর যিনি অনন্য ভক্তিযোগে তাঁর আরাধনা করেন, তিনি তাঁকেই অনুগ্রহ করেন।

কিন্তু আত্মাকে যে জানতেই হবে। এটা হচ্ছে ঋষিগণের নির্দেশ। 'আত্মানং বিদ্ধি'। আর এই আত্মোপলব্ধির ভেতর দিয়েই আমরা চিনবো আমাদের ভারতজননীকে, চিনবো জগজ্জননীকে।

আমাদের এই ভারতমাতা বিশ্বজননীরই প্রতিচ্ছবি। জগজ্জননী সতীমাতার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পতিত হয়েই ভারতবর্ষে একান্নটি পীঠস্থান রচিত হয়েছে। তাই ভারতভূমি পুণ্যভূমি, আর পৃথিবীর অন্য সকল দেশ ভোগ-ভূমি। এও পুরাণেরই কথা। ভারত-জননীকে চিনতে হলে জননীর কৃপা চাই, অনুগ্রহ চাই, ইতিহাস বা ভূগোলের পাতায়, এমনকি, নানা শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যেও জননীর আত্মিক সত্তার সন্ধান পাওয়া যাবে না। শ্রদ্ধাবান সাধকের আত্ম-সমাহিত চিত্তেই ভারত-মাতার যথার্থ রূপটি প্রতিফলিত হয়, তাঁর অন্তরে যখন মহামৌন বিরাজ করে, তখনই তাঁর দিব্যকর্ণে ভারতাত্মার বাণী ধ্বনিত হয়।

ভারতাত্মার বাণী শাশ্বত, যতদিন বিশ্বের পক্ষে এ বাণীর প্রয়োজন

আছে, ততদিন ভারত মৃত্যুঞ্জয়ী. এ কথা বলেছেন ভারতের মহাপুরুষগণ। তাই বাইরের ও ভেতরের শত শত আঘাত সত্ত্বেও ভারতের সভ্যতা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ 'গিরিশ (Greece) আঁধারে আজ পোহাইছে রাতি', 'দোর্দন্ত প্রতাপ যাব কোথায় সে রোম'?, আর কোথায়ই বা মিশর, এসিরিয়া, বাবিলোনিয়া? এ দিকে প্রতীচ্যের বলদৃপ্ত বিজ্ঞান-দীপ্ত সংস্কৃতি-সম্পর্কে স্বামিজী বলেছেন—পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা একটা. আগ্নেয়গিরির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত রয়েছে, কে জানে?

শাশ্বত ভারতের মর্মবাণী কি? জ্ঞানযোগী বলবেন—ভারতের বিশিষ্ট সাম্যবাদ—বৈচিত্র্যের ভেতর ঐক্যের অনুভূতি, সর্বভূতে ব্রহ্মোপলব্ধি। কর্মযোগী বলবেন, যোগস্থ হয়ে, সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে, যজ্ঞার্থে বা লোকসংগ্রহের জন্যে কর্ম কর, এটাই ভারতাত্মার বাণী। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

'কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বফল-স্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার'।

আর প্রেমিক বলবেন—ভারতের বাণী হচ্ছে—প্রেমের সাধনার ভেতর দিয়ে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন, পরিপূর্ণ রূপান্তর,—যে প্রেমে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি বাঞ্ছা নেই, আছে প্রিয়তমের ইন্দ্রিয়-প্রীতি বাঞ্ছা!

ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্'। (৪।১১)

অর্থাৎ—

'যে আমারে ভজে যৈছে তারে ভজি তৈছে'। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

এই উদার বাণী ভারতের অন্তরাত্মা থেকেই ধ্বনিত হয়েছে। এও ভারতবাসীর পরম উপলব্ধিরই কথা। যিনি জ্ঞানীর নিকট নির্গুণ, নিরাকার পরব্রহ্ম, যিনি অবাঙ্‌মনসোগোচর, উপনিষদ যাঁর সম্পর্কে বলেছেন 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ', তিনিই ভক্তের প্রেমের আকর্ষণে যোগমায়ার দ্বারা নিজের স্বরূপ আচ্ছাদন করে তাঁর সঙ্গে নর-রূপে লীলা করেন, তাই ভক্তগণ নিত্যকাল এই লীলারস-মাধুর্য আস্বাদন করে থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে বলেছেন—

'কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নব কিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ' ॥

ভারতের ভক্তগণ যুগে যুগে এই লীলারস-মাধুর্য আস্বাদন করেছেন,. কেউ প্রভুরূপে তাঁর সেবা করেছেন, কেউ সখারূপে তাঁর কাঁধে চড়েছেন ও তাঁকে কাঁধে চড়িয়েছেন, কেউবা গোপালরূপে তাঁকে লালন ও তাড়ন করেছেন, কেউবা প্রিয়তমরূপে তাঁর ভজনা করে মিলন ও বিরহের মাধুর্য সম্ভোগ করেছেন, — এ সেই মিলন, যার ভেতর জেগে আছে একটা চিরন্তন বিরহ আবার এ হচ্ছে সেই বিরহ, যার আস্বাদন 'তপ্ত ইক্ষু চর্বণ মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন'। এদিকে শ্রীরামপ্রসাদ যাঁকে জগন্মাতারূপে পেয়েছেন, যিনি কন্যারূপে তাঁর বেড়া বেঁধে দিয়েছেন, ভক্ত সাধক যে ভাষায় তাঁর সঙ্গে আবদার-অভিমান করেছেন, তাঁকে তিরস্কার করেছেন, সে ভাষার কি তুলনা আছে ?

'বারে বারে ডাকি মা মা বলিয়ে,
মা বুঝি রয়েছিস চক্ষু কর্ণ খেয়ে,
মাতা বিদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে'
মা বেঁচে তাহার কি ফল বলনা'।

অথবা—

'সংসারে আনিয়ে মাগো করলি আমায় লোহাপেটা,
আমি তবু কালী বলে ডাকি সাবাস আমার বুকের পাটা'।

শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত 'শাশ্বত ভারত' নানা যুগের সেই সব সাধক ও ভক্তদের কাহিনী, যাঁদের সঙ্গে লীলারস-আস্বাদনের লোভে শ্রীভগবান নেমে আসেন বৈকুণ্ঠধাম থেকে মর্ত্যের ধূলিতে। তাঁদের পাদ-রজঃ-স্পর্শেই তো মর্ত্য পরিণত হয় স্বর্গে।

সাধারণতঃ আমরা সাধক ও সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে কাউকে বৈষ্ণব, কাউকে শৈব, কাউকে বা শক্তি সাধক বলে চিহ্নিত করি। কিন্তু তাঁর কাছে তো এ সব ভেদবুদ্ধি নেই, প্রেমের আকর্ষণ যেখানে গভীর, সেখানেই তিনি বাঁধা পড়েন। 'শাশ্বত ভারতের' লেখক

নানা যুগের ভারতীয় সাধকদের সঙ্গে শ্রীভগবানের লীলা-বিলাসের কয়েকটি চিত্র নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত করেছেন। এতে যেমন 'মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর' রচয়িতা জয়দেবের কথা আছে, তেমনি মাতৃনামে তন্ময় শ্রীরামপ্রসাদের কথা আছে, এতে দেবী ভবতারিণী ও শ্রীরামকৃষ্ণের কথা আছে, বালরামচন্দ্রের মন্ত্রে দীক্ষিত জটাধারীর কথা আছে, বালগোপালের মন্ত্রে দীক্ষিত গোপালের মার কথা এবং শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ও শ্যামসুন্দরের কথা আছে, আরও নানা 'সম্প্রদায়ের' নানা সাধক-সাধিকার কথা আছে। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে যে সব সাধক বা সিদ্ধ-পুরুষের কথা অনুল্লিখিত রয়েছে, গ্রন্থের অন্যান্য খণ্ডে তাঁদের দিব্য জীবনের অলৌকিক কাহিনী লেখক বাঙ্গালী পাঠকবর্গকে পরিবেশন করবেন, এই ব্রতই তিনি গ্রহণ করেছেন। আমরা প্রার্থনা করি, লেখকের এই মহৎ সঙ্কল্প সার্থক হোক। আমরা এ কথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, লেখক ভক্তের সঙ্গে ভগবানের লীলা-বিলাস বর্ণনায় যথার্থ অধিকারী। তাঁর রচনা-নৈপুণ্যের গুণে প্রত্যেকটি 'কাহিনী'ই আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে কাহিনীমাত্রেই কাল্পনিক নয়, অসাধারণ মানুষের জীবনে যা ঘটে, বুদ্ধিমানের চুলচেরা বিচারে যার ব্যাখ্যা চলে না, অথচ যুগ-যুগ ধরে ভক্তহৃদয়ের অনুভূতি নিঃসংশয়ে যাকে সত্য বলে গ্রহণ করে, তাকেও কাহিনী বলা অসঙ্গত নয়। ইংরেজিতেও 'True story' কথাটির ব্যবহার আছে।

আমরা আশা কোরবো 'শাশ্বত ভারত' বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজ করুক। আজকের এই বিপর্যয়, প্রমত্ততা, বিভ্রান্তি ও স্বধর্মভ্রষ্টতার যুগে গ্রন্থখানি যদি স্বল্পসংখ্যক পাঠকের মনেও শ্রদ্ধাবোধের উদ্রেক করে, মুষ্টিমেয় পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির চিত্তেও যদি বিশ্বাসের আলো জ্বালিয়ে দেয়, তা হলেই লেখকের শ্রম সার্থক হবে।

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

সূচী

শাশ্বত ভারত

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। ....

পিতামহ ভীষ্ম রণস্থলে শরশয্যায় শায়িত আছেন।

মুক্ত প্রান্তর।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। সেদিনকার মতো যুদ্ধ শেষ।

দুই পক্ষের বহুতর সেনা আপন আপন অস্ত্র শিবিরে রেখে এই পুরুষ-প্রধানকে দেখতে এসেছেন, প্রণাম জানাতে এসেছেন।

ধীরে ধীরে নতমস্তকে এলেন যুধিষ্ঠির। সঙ্গে চারি অনুজ আর শ্রীকৃষ্ণ। সকলে পিতামহের পদতলে আশ্রয় নিলেন।

পিতামহ বুঝতে পেরেছেন, দেহত্যাগের আর অধিক বিলম্ব নেই। কিন্তু এখনও পর্যন্ত জীবনের মূলমন্ত্রটি আর কাউকে শোনানো হয়নি।—

ডাকলেন যুধিষ্ঠিরকে।—

শোন যুধিষ্ঠির! তোমাকে আজ চরম রহস্য ব'লে বিদায় নিই।—মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নেই।

জ্ঞানবৃদ্ধ পিতামহ। ভারতের এক অদ্বিতীয় পুরুষ। তিনি তাঁর জীবন-গায়ত্রী দান করলেন যুধিষ্ঠিরকে।

যুধিষ্ঠিরও ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ প্রাণপুরুষ। তিনি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষী রেখে ভারতের প্রতিনিধিরূপে অসীম শ্রদ্ধায় সেই মন্ত্র গ্রহণ করলেন।

এক যুগ তার পরের যুগকে ভারত-আত্মার বাণী শোনালো।

এক যুগ বিগত যুগের বাণী ধারণ করলো।

এর পরে যখনই ভারত ভুলতে বসেছে তার প্রাণগায়ত্রী, তখনই ভারতের এমন সৌভাগ্য যে, একজন না একজন যুগন্ধর মহাপুরুষ ভারতে ভারতীয়ের মাঝেই আবির্ভূত হয়েছেন। শুনিয়েছেন সেই

একই মন্ত্র—নরনারায়ণের বন্দনামন্ত্র। —মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নেই।

'শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।'

ভারতীয়ের কাছে মানুষই সবাকার শ্রেষ্ঠ, এমনকি স্বর্গের দেবতার চাইতেও।

দেবতাদের কাছেও ভারত লোভনীয় ভূমি, একটি তীর্থ-প্রাঙ্গণ। যুগ যুগ ধ'রে স্বর্গের দেবতারা তাই ভারতের মানুষ হ'য়ে জন্মাতে চরম আগ্রহ দেখিয়েছেন, সাধনা করেছেন। শুরু হ'তেই দেবতারা অসীম পুলকে ভারতীয়ের মাঝে এসেছেন; তাদের সঙ্গে মিশেছেন, খেলেছেন, ঝগড়া-বিবাদ করেছেন, তাদের ভালোবেসেছেন। ভারতেব মানুষ তাঁদের প্রিয়তম। তাদের সঙ্গে মিশতে, লীলা করতে তাই দেবতাদের বাসনা-কামনা, সখ-আহ্লাদ, সুখ শান্তি।

তাঁদের কেহ হয়েছেন পিতা, কেহ হয়েছেন মাতা; কেহ বা পুত্র, কেহ বা কন্যা; কেহ বা ভ্রাতা ভগ্নী, সখা বা সখী। শুধু কি এই? ভারতভূমে তাঁরা ভারতবাসীর স্ত্রীরূপেও লীলাবিলাস করেছেন।

মধুরতম এই সব লীলাকাহিনী!

স্বর্গের দেবতা কন্যা সেজে বাপের বেড়ার বাঁধন ফিরিয়ে দিয়েছেন। মন্দিরের পূজারী মারা গেলে বিগ্রহ-দেবতা পুত্ররূপে গলায় ধড়া প'রে অশৌচ পালন করেছেন, আর শ্রাদ্ধ করেছেন। বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হ'লে দূর দেশে গিয়ে নিজে সাক্ষ্য দিয়ে সেই বিবাদ মিটিয়ে দিয়েছেন। আবার সখ হ'লে দিব্যি মেয়েটি সেজে শাঁখারির হাত হ'তে শাঁখাও পরেছেন।

এ-তো হ'ল চিত্রের এক দিক। দেবতারা মানুষ সেজে মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, আনন্দ পেয়েছেন।—সেই দিক।

এছাড়া অন্য দিকও আছে। স্বর্গের দেবতাকেও ভারতের মানুষ প্রাণ ভ'রে ভালোবেসেছে, আপন ক'রে নিয়েছে।

ভারতের মানুষ আদিকাল থেকেই দেবতাকে একান্ত আপন জন, অন্তরঙ্গ ব'লে ধ'রে নিয়েছে। দেবতাকে তারা নাগালের বাইরে রাখেনি। তারাও তাঁদের ভালোবেসেছে, তাঁদের সঙ্গে মিশেছে, নিতান্ত ঘরোয়াভাবেই মিশেছে। নানারূপ মধুর সম্বন্ধ তাঁদের সঙ্গে তারা পাতিয়েছে। তাঁদের দুঃখে চোখের জল ফেলেছে, সুখে আনন্দে মেতেছে। তাঁদের নিয়ে বিদ্রূপ পরিহাস করতেও তারা ছাড়েনি।

স্বর্গের দেবতা তাদের কাছে নিতান্ত সাধারণ মানুষ। রামায়ণের সীতা লক্ষ্মী-ঠাকরুণ হ'লেও একেবারে তাদেরই ঘরের বধূ। রাম, কৃষ্ণ এঁরা দেবতা হ'লেও ভারতেরই যেন এক একটি বালক।

স্বর্গের দেবতা বছর পরে একবার বাপের বাড়ীতে আসেন। তখন ঘরে ঘরে কত না আনন্দ! যেন নিজের মেয়েই বহুদিন বাদে শ্বশুর বাড়ী হ'তে বাপের বাড়ীতে ফিরে এলো। সেদিন সর্বত্রই উৎসবের সমারোহ। আবার এই দেবতাই পুনরায় যেদিন স্বামীর ঘরে চ'লে যান, সেদিন সকলেরই অন্তরে বেদনা, মুখ বিষাদ-করুণ। সবাকার চোখে, প্রতি বাপ-মায়ের চোখেই সেদিন জল। তাদের নিজের মেয়েই যেন ঘর আঁধার ক'রে স্বামীর ঘরে চলেছে! কতদিন বুঝি-বা আর তার সঙ্গে দেখা হবে না। ঘরে ঘরে সেদিন দীর্ঘশ্বাস, হাহুতাশ!

দেবতাদের উৎসব হবে। সে উৎসবে সবাকারই ঢালা নিমন্ত্রণ। সেখানে স্বর্গের দেবতাদের সঙ্গে ভারতের মাটির মানুষ এক পঙক্তিতে ব'সে সমান আনন্দ উপভোগ ক'রে থাকে। চরম দুঃখী যে, সেও সেদিন ক্ষণেকের জন্যে দুঃখ দূরে সরিয়ে রেখে ধনীর দুলালের মতই আনন্দের সাগরে সাঁতার কাটে।

শিব ঠাকুরের বিবাহ। বুড়ো শিব বর সেজে এসেছেন। তাঁর মাথায় জটা, কপালে ভস্ম, পরনে বাঘের ছাল, গলায় দুলছে সাপ। অপরূপ সাজে সজ্জিত এই বৃদ্ধ বরকে দেখে এয়োরা অবাক!

'আই আই আই ঐ বুড়ো কি
এই গৌরীর বর লো!'

জননী মেনকা এক হাতে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে আর হাতে প্রদীপ ধ'রে জামাই বরণ করতে এলেন। মেনকার মতো কত মায়ের বুকই তখন যেন হঠাৎ ছ্যাঁক ক'রে ওঠে! মুখ দিয়ে বের হয় টানা দীর্ঘশ্বাস! অতর্কিতে নিজের মেয়ের অদৃষ্টের কথাই বুঝি মনে পড়ে!

উমা-মহেশ্বর। সেদিন কি জানি কি হ'ল। উমা প্রাণ খুলে আর মহেশের সঙ্গে কথাটি বলেন না। প্রণয় সম্ভাষণ সেদিন বন্ধ। কী করুণ সেদিন ভোলানাথের অবস্থা!

'বড় প্যাঁচে পড়েছে এবার ভোলা দিগম্বর।
অভিমানী উমারাণী বলেনি তায় প্রাণেশ্বর॥'

আহা! সকলেরই মুখে—আহা!

শিব-সতীর কলহ, অন্নপূর্ণা আর উমা এই দুই সতীনের কোন্দল, নারদঠাকুরের ঝগড়া বাধিয়ে মজা দেখা—এ সব চিত্রতো ভারতের ঘরে ঘরে।

দেবতায় আর মানুষে মিশিয়ে গড়া এই জাতীয় কত কাহিনী ভারতের এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে! কত মধুর লীলা-বিলাস! খুঁজলে ভারতের সকল জায়গা থেকে অসংখ্য এই জাতীয় লীলা-কাহিনী আহরণ করা যাবে।—যাবে গ্রাম গঞ্জ শহর বন্দর থেকে; রাজপ্রাসাদ আর পর্ণকুটির থেকে; মন্দির থেকে; তীর্থ-প্রাঙ্গণ থেকে; পাহাড় গাঙ অরণ্য কান্তার থেকে।

আবহমান কাল থেকে এই সব কাহিনী ভারতের সাধারণ লোকজনের মনে সুগভীর ও সুস্পষ্ট ছাপ ফেলে আসছে; এখনও সমানভাবে ফেলে চলেছে।

এসবের মূলে হয়ত ঐতিহাসিক কোনও ভিত্তি নেই। বিজ্ঞানীদের কাছে এসব হয়ত একেবারেই হাস্যকর। যুক্তিবাদী বিচারবানদের কাছে এসব হয়ত নিরর্থক, একেবারে আজগুবি।

হোক।

তবুও জনমানসে, ভারতের আপামর জনসাধারণের চিত্তপটে সুন্দর আর স্পষ্টভাবে আঁকা এই সব ছাপ কে অস্বীকার করবে? এ সব যে নির্ভেজাল, একেবারে সত্য!

—যেমন সত্য আকাশের ঐ সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র; এই রাত্রি, এই দিন। —যেমন সত্য সকল যুগের শিশুমনের কাছে রূপকথার পক্ষীরাজ ঘোড়া, সোনার কাঠি, রূপার কাঠি, সাতভাই চম্পা, সুয়োরাণী, দুয়োরাণী—এই সব কাহিনী।

এ সব শুধু সত্যই নয়, অমূল্য সম্পদও!

দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে এসবের মূল্য অপরিসীম, অপরিমেয়। কোনও ইতিহাস, কোনও জাতি এই সব সম্পদ উপেক্ষা করতে পারে না। কোনও দিনই করেনি। আগামী দিনেও অস্বীকার করবে না।

সাক্ষীগোপাল

বিদ্যানগর নামে এক গ্রাম।......

সেই গ্রামে এক সময়ে দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে বড়ই ভাব ছিল। তাঁদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ, অপর জন যুবক।

একদিন এই দুজনের একসঙ্গে তীর্থ দর্শনের বাসনা হ'ল।

বৃদ্ধ বললেন, বৃদ্ধ হয়েছি। পথের কষ্টের কথাই চিন্তা করছি।

যুবক বললেন, আপনার চিন্তার কোনও কারণ নেই। সব সময়ে সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমি আপনার সেবা করবো।

তাঁরা তীর্থদর্শনে বেরিয়ে পড়লেন।

গয়া, বারাণসী, প্রয়াগ, মথুরা হ'য়ে তাঁরা এলেন বৃন্দাবনে।

কেশীঘাটে, কালীয় হ্রদে তাঁরা স্নান করলেন। বৃন্দাবনের চারিদিক ঘুরে তাঁরা নানান জায়গা দেখলেন। তাঁরা মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে বহু দেববিগ্রহ দর্শন করলেন। শেষে শ্রীগোপালের মন্দিরে এসে তাঁরা বিশ্রাম নিলেন।

শ্রীগোপাল! নয়নাভিরাম তাঁর রূপ! সে রূপ দেখে তাঁদের নয়ন সার্থক হ'ল। প্রাণ শীতল হ'ল। তাঁরা কৃতার্থ হলেন।

> 'গোপাল সৌন্দর্য্য দোঁহার মন নিল হরি।
> সুখ পাঞা রহে তথা দিন দুই চারি॥'

যুবক বৃদ্ধের সেবা করেন। বৃদ্ধ তাই পরম সন্তুষ্ট। যুবকের ব্যবহারে কথাবার্তায় আর সেবায় তিনি মুগ্ধ।

একদিন কথায় কথায় বৃদ্ধ বললেন, তুমি আমার খুব সেবা করলে। আমার সহায় হ'য়ে তীর্থ করালে। পুত্রও পিতার এত করে না। তোমার জন্যেই প্রবাসে আমি কোনও কষ্ট পেলাম না। তোমাকে সম্মান দেখানো আমার অবশ্য কর্তব্য। তা না করলে লোকে আমায় অকৃতজ্ঞ বলবে। আমি অঙ্গীকার করছি, দেশে ফিরে গিয়ে

তোমার সঙ্গে আমি আমার কন্যার বিবাহ দেব। তোমাকে আমি কন্যা দান করবো।

যুবক বললেন, এমন অসম্ভব কথা কইবেন না।—আপনি মহাকুলীন। আপনি বড় বিদ্বান। আপনার প্রচুর ধন সম্পত্তি। এ সবেই আপনি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমি কুলীন নই। আমার বিদ্যা-ধন কিছুই নেই। আমি মূর্খ। আমি দরিদ্র। আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-কামনায় আপনার সেবা করেছি। কাউকে সেবা করলে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হন, বিশেষত ব্রাহ্মণ-সেবায়।

বৃদ্ধ বললেন, তুমি সংশয় ক'র না। তোমাকেই আমি কন্যা দান করবো।

যুবক বললেন, আপনার স্ত্রী-পুত্র আছে। আপনার বহু জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। বহু বন্ধুবান্ধব আপনার। তাঁদের সম্মতি বিনা কন্যাদান সম্ভব নয়। ভীষ্মকের ইচ্ছা হয়েছিল, নিজ কন্যা রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করবেন। কিন্তু পুত্র বাদী হলেন। তাঁর অমতে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কন্যা দান করতে পারলেন না।

বৃদ্ধ বললেন, কন্যা আমার। সে আমার 'নিজ ধন'। আমার 'নিজ ধন' আমি দান করবো, এতে কে বাধা দেবে? আর যদি কেউ দেয়ও, তাকে তিরস্কার ক'রে আমার কন্যাকে আমি তোমার হাতে সমর্পণ করবো। সংশয় ক'র না। তুমি সম্মত হও। আমি সুখী হবো।

যুবক বললেন, বেশ। যদি আমাকে কন্যা দান করতে একান্তই মন চায়, তবে শ্রীগোপালের সামনেই অঙ্গীকার করুন।

বৃদ্ধ বললেন, আমি শ্রীগোপালকে সাক্ষী রেখে বলছি, দেশে ফিরে গিয়ে আমি আমার কন্যাকে তোমার হাতে সমর্পণ করবো।

যুবক বললেন, গোপাল, তুমি সাক্ষী রইলে। যদি এই বৃদ্ধের কথায় পরে কোনও রকম হেরফের দেখি, তোমাকে তখন সাক্ষ্য দিতে হবে কিন্তু।

দুজনে দেশে ফিরে এলেন।

কয়েকদিন যেতে না যেতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশ চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন।—তীর্থস্থানে গোপালকে সাক্ষী রেখে ব্রাহ্মণকে কথা দিয়েছি। সে কথা এখন কেমন ক'রে রক্ষা করি!

এক দিন স্ত্রীপুত্র জ্ঞাতিবন্ধু সবাইকে ডেকে তিনি একত্র করলেন। তাঁদেব কাছে মন খুলে সব কথা বললেন।

—বৃন্দাবনে গোপালকে সাক্ষী রেখে ব্রাহ্মণকে আমি কন্যা দান করেছি। —যে ব্রাহ্মণ প্রবাসে সেবায় যত্নে সব রকমে আমাকে পরিতুষ্ট করেছে।

সকলে হায় হায় ক'রে উঠলেন।—বললেন, অসম্ভব কথা! নীচ পাত্রে কন্যা দিলে কুল নষ্ট হবে। সবাই উপহাস করবে। তাছাড়া, সে মূর্খ। সে দরিদ্র। 'ঐছে বাৎ মুখে তুমি না কহিও আর।'

বৃদ্ধ বললেন, তীর্থে কথা দিয়েছি। কথার খেলাপ করি কেমন ক'রে? কন্যা দান আমাকে করতেই হবে।

জ্ঞাতিরা ভয় দেখালেন, নীচ ঘরে কন্যা দিলে আপনাকে আমরা ত্যাগ করবো। স্ত্রী-পুত্র বললেন, আমরা তাহলে বিষ খেয়ে মরবো।

বৃদ্ধ বললেন, সাক্ষী ডেকে এনে সে কন্যা নিয়ে নেবে। লাভের মধ্যে আমার কথার খেলাপ হবে, আমার ধর্ম নষ্ট হবে।

পুত্র হেসে ফেলল। —সাক্ষী হ'ল কিনা পাথরের এক মূর্তি! তা-ও অত দূর দেশের!

—তুমি পাগল হয়েছ বাবা? সাক্ষী হ'তে কে এখানে আসবে? তুমি একটুও চিন্তা ক'র না!

কিন্তু আমি যে কথা দিয়েছি।—বৃদ্ধ বললেন।

স্ত্রী-পুত্র বললেন, বেশ, এমন কথা ব'ল না, আমি এসব বলি নি। তুমি বলবে, এসব কথা আমার স্মরণ হচ্ছে না।

বৃদ্ধ মহাভাবনায় পড়লেন। দিনরাত শুধু গোপালকে ডাকেন।—গোপাল, আমাকে উদ্ধার কর। আমার ধর্ম রক্ষা কর। আমার নিজ-জন না মরে, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী অসন্তুষ্ট না হয়, এসব তুমি সামলাও। আমি তোমার শরণ নিলাম। শরণাগতকে রক্ষা কর, গোপাল।

একদিন যুবক এলেন। বৃদ্ধকে প্রণাম ক'রে বললেন, আপনি আমাকে আপনার কন্যা দান করবেন অঙ্গীকার করেছিলেন। সে বিষয়ে এখন নীরব কেন?

বৃদ্ধ নিরুত্তর রইলেন।

তাঁব পুত্র লাঠি নিয়ে যুবককে তাড়া করলেন।

—এত সাহস তোমাব? আমার ভগিনীকে বিবাহ করতে চাও? বামন হ'য়ে চাঁদ ধববাব সখ?

লাঠি দেখে যুবক চলে গেলেন।

পব দিন আবাব এলেন। সেদিন একা নয়। এলেন গ্রামের বহু লোকজন সঙ্গে নিয়ে।

—ইনি আমাকে এঁর কন্যা দান করবেন ব'লে অঙ্গীকার কবেছিলেন। এখন সে অঙ্গীকাব পালন করছেন না। আপনারা এঁর ব্যবহাব দেখুন।

গ্রামের লোকেরা জিজ্ঞাসা কবলেন, এঁকে কন্যা দান করছেন না কেন?

বৃদ্ধ বললেন, কবে কোথায় কি বলেছি আমার স্মরণ নেই।

পুত্র বললেন, তীর্থ যাত্রাকালে আমার পিতার কাছে বহু টাকা-কড়ি ছিল। সেই টাকা-কড়ির লোভে তাঁকে একলা পেয়ে ধুতুবা খাইয়ে পাগল ক'রে এই লোক তাঁর যথাসর্বস্ব নিয়ে নিয়েছে। প্রকাশ করেছে, চোরে নিয়েছে। এখন আবার বলছে, ইনি আমায় কন্যা দিতে চেয়েছেন। আপনারা সকলে বিচার করুন। ইনি কি আমাদের বংশের মেয়ে পাবার যোগ্য? আর, আমার পিতা কি এমন অসম্ভব কথা কখনও বলতে পারেন?

গাঁয়ের লোকেরা ভাবলেন, টাকার লোভে হয়তো বা এই যুবক এমন কুকাজ করতেও পারেন। টাকার লোভে মানুষ মাঝে মাঝে সবই করে। তখন ধর্মভয়ও লোপ পায়।

যুবক বললেন, শুনুন সকলে। বিচারে জিতবার জন্যে এই বৃদ্ধ এখন মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। আমার সেবায় তুষ্ট হ'য়ে ইনি

আমাকে কন্যা দান করবেন অঙ্গীকার করেছিলেন। আমি তখন নিষেধ করেছিলাম। ইনি শোনেন নি। আমি বলেছিলাম, আমি আপনার কন্যার যোগ্য বর নই। আমি বারবার এই কথা বলেছিলাম। তবুও ইনি বারংবারই বলেছেন, তোমাকেই আমি আমার কন্যা দেবো, তুমি স্বীকার কর। আমি বলেছিলাম, আপনার স্ত্রী-পুত্র জ্ঞাতি, এঁদের এ বিষয়ে মত হবে না। আপনি কন্যা দিতে পারবেন না। আপনার মিথ্যা বলা হবে। ইনি তখন বললেন, নিজের কন্যাকে দান করবো, এ-বিষয়ে অপরে কে নিষেধ করতে পারে? এ কন্যা আমার 'নিজ ধন'। আমি তখন বললাম, বেশ, তবে মন শক্ত ক'রে এই মন্দিরে ব'সে গোপালকে সাক্ষী রেখে গোপালের সামনে এই কথা বলুন। ইনি গোপালের সুমুখে অঙ্গীকার করলেন, গোপাল, তুমি জেনে রাখ, এই যুবককে আমি আমার কন্যা দান করবো। আমি গোপালকে বললাম, গোপাল, যদি এই ব্রাহ্মণ কথা না রাখেন, তোমায় কিন্তু তখন সাক্ষ্য দিতে হবে। আপনারা সকলে নিশ্চিত জানুন, গোপাল আমার সাক্ষী। গোপালের সাক্ষী ত্রিভুবন মানে।

বৃদ্ধ বললেন, এ উত্তম কথা। গোপাল যদি এখানে এসে নিজ মুখে সাক্ষ্য দেন, আমি নিশ্চয়ই এঁকে কন্যা দেব।

পুত্র বললেন, এ তো ভাল কথা।

বৃদ্ধ মনে মনে ভাবলেন, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমার অঙ্গীকার রাখবেন। তিনি দয়াময়। আমি অসহায়।

পুত্র ভাবলেন অন্যরূপ। প্রতিমা কখনও কি নিজে সাক্ষ্য দেয়? তা-ও আবার পাথরের প্রতিমা? সাক্ষ্য দেবে এতদূর হেঁটে এসে?—'অসম্ভব এই কথা, গোপাল কহিবে!'

যুবক বললেন, বেশ। তাহলে এবার পত্র লেখা হোক। আবার যেন কথার হেরফের না হয়।

গাঁয়ের লোকেরা পত্র লিখলেন। সাক্ষী রইলেন বৃদ্ধ আর যুবক। এক জন রইলেন মধ্যস্থ।

যুবক বললেন, শুনুন সকলে। এই বৃদ্ধ ধার্মিক। কথা রাখতে না পেরে ইনি দুঃখিত। ইনি স্বজনের ভয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। এঁরই পুণ্যের জোরে আমি গোপালকে বৃন্দাবন হ'তে এখানে সাক্ষীরূপে আনবো। এই বৃদ্ধের সত্যরক্ষা যাতে হয়, আমি তা-ই করবো।

যাঁরা নাস্তিক, তাঁরা হাসলেন।

যাঁরা ধার্মিক, তাঁরা ভাবলেন, হ'তেও পারে।

যুবক বৃন্দাবনে এলেন। এলেন গোপালের মন্দিরে।

গোপাল, এলাম।

নীরব রইলেন গোপাল।

বড় আশা ক'রে ছুটে এসেছি, গোপাল। অন্তর্যামী তুমি : তুমি সব টের পাও। কিছুই তোমার কাছে লুকানো থাকে না। আমার কথাটি বিশ্বাস কর।—

'কন্যা পাব মোর মনে ইহা নাহি সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায় এই বড় দুঃখ॥'

গোপাল কথা কইলেন না।

গোপাল, ব্রাহ্মণের কথাটি রাখ। তাঁর ধর্ম রক্ষা কর।

তবুও গোপাল নিরুত্তর রইলেন।

তোমাকে সাক্ষ্য দিতে যেতে হবে, গোপাল। যেতে হবে বিদ্যানগর অবধি। ······সাক্ষ্য দেবে চল। চল। ···না। হাসলে চলবে না। হেসে আমাকে ভোলাতে পারবে না। তোমাকে সাক্ষ্য দিতে যেতেই হবে। জান না, সব জেনেও যে সাক্ষ্য না দেয়, তার পাপ হয়? ···কি? কথা কইবে না? যাবে না? ওটি হচ্ছে না। তোমাকে যেতে হবে। যেতেই হবে। না গেলে আমি এখান থেকে এক পা-ও নড়বো না। জলস্পর্শ করবো না। না খেয়ে এখানেই প'ড়ে থাকবো।

দুগ্ধশুভ্র অনাবিল প্রাণের কাছে কঠিন পাষাণ বিচলিত হ'ল। সরল সত্যের সুমুখে প্রস্তর-বিগ্রহ বাঙ্ময় হ'য়ে উঠলো। গোপাল কথা কইলেন।

—ব্রাহ্মণ, তুমি ঘরে ফিরে যাও। গিয়ে সবাইকে এক সভায় নিমন্ত্রণ করো। সেখানে আমায় স্মরণ ক র। আমি সকলের সামনে উপস্থিত হ'য়ে সাক্ষ্য দেবো।

যুবক বললেন, যদি তুমি চতুর্ভুজ মূর্তি ধ'রেও নিজমুখে বল, গাঁয়ের লোক তা বিশ্বাস করবে না। ঠিক এই মূর্তিতে, এই বেশে নিজে গিয়ে যদি বল সাক্ষ্য দাও, তবেই সকলে বিশ্বাস করবে।

গোপাল হেসে ফেললেন।—

সশরীরে পাথরের প্রতিমা চলে, কোথাও কি এমন শুনেছ, বিপ্র?

'বিপ্র বলে নাহি পাব চলিতে চরণে।
প্রতিমা হইয়া তবে কথা কহ কেনে॥'

—যে কথা কইতে পারে, সে চলতেও পারে। তুমি আমায় ফাঁকি দিতে পাববে না, গোপাল। তুমি সব পার। তোমাব অসাধ্য কোনও কাজ নেই। আব, আমার জন্যে না হয় যা কখনও কেউ শোনে নি, যা কখনও কেউ দেখে নি, তাই-ই ক'লে। তোমাকে যেতেই হবে। যেতেই হবে বিদ্যানগর অবধি। আমি তোমার কোনও কথা আর শুনছিনে।

গোপাল আবার হাসলেন। এবার সম্মতির হাসি!

—বেশ, আমি যাবো। তবে এক শর্ত রইল। তুমি আগে আগে যাবে। আমি যাবো তোমার পিছু পিছু। আমি যাচ্ছি কি যাচ্ছি না তা দেখবার জন্যে তুমি পিছন দিকে তাকাবে না। যদি বাবেকও তাকাও তবে আমি সেখানেই থেকে যাব। আর এক পা-ও এগুবো না।

আচ্ছা, তবে বুঝবো কি ক'রে, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছ?

নূপুরের ধ্বনি শুনবে। সেই গুঞ্জন শুনলেই বুঝবে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছি।

জয় শ্রীগোপাল জয় মদনমোহন।
যশোদাজীবন জয় রাধিকারমণ॥

খুসিমনে যুবক চলেছেন গাঁয়ের পানে। পিছনে চলেছেন গোপাল।

ঝুমুঝুমু ঝুমুঝুমু।

নূপুর বেজে চলে……ঝুমুঝুমু ঝুমুঝুমু।

যুবক চলেছেন। কান তাঁর প'ড়ে রয়েছে শুধু ঐ শব্দের পরেই—ঝুমুঝুমু ঝুমুঝুমু।

যুবক চলেছেন। শুনছেন শুধু অবিরাম কর্ণরসায়ন ঐ মধুর গুঞ্জন—

ঝুমুঝুমু ঝুমুঝুমু।

নিদ্রা নেই, পাছে শব্দ শুনতে না পান।

আন দিকে মন নেই। পাছে কি জানি কি ঘ'টে যায়।

যবক শুধু চলেছেন। পিছনে গোপাল……

ঝুমুঝুমু ঝুমুঝুমু।

যুবক চলেছেন, চলেছেন আর চলেছেন। পিছনে অবিরাম নূপুর বেজে চলেছে।—ঝুমুঝুমু ঝুমুঝুমু। ঝুমুঝুমু ঝুমুঝুমু।

এমনি ক'রে একদিন তাঁরা এসে পড়লেন বিদ্যানগরের একেবারে পাশেই।

কিন্তু হঠাৎ এ কী হ'ল! শব্দ থেমে গেলো কেন? নূপুর-গুঞ্জন আর শোনা যায় না কেন? গোপাল কি আর তবে আসছেন না?

যুবক পিছনে তাকালেন।

গোপাল ফিক ক'রে হেসে ফেললেন।

—আর তো আমার যাওয়া হবে না।

নূপুরধ্বনি বন্ধ হ'ল কেন? কেন শুনতে পেলাম না নূপুর-গুঞ্জন?

নূপুরের মধ্যে বালি প্রবেশ করেছিল যে।

যেন কূলে এসে তরীখানি ডুবে গেলো। যুবকের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। যুবক হাহাকার ক'রে উঠলেন।

ব্রাহ্মণ, আমি তোমার বাড়ীর একেবারে পাশেই এসে পড়েছি। এতেই তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। তুমি গাঁয়ের সবাইকে এখানে ডেকে আন। তোমার কথায় সকলেই এখানে আসবেন। আমি

এখান থেকেই তোমার হ'য়ে সাক্ষ্য দেবো। আমি আর এগুবো না। এই ব'লে 'হাসিয়া গোপালদেব তথাই রহিল'।

গাঁয়ের সবাই অভাবনীয় এই ব্যাপার শুনে দলে দলে ছুটে এলেন। ছুটে এলেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাঁর স্ত্রী-পুত্র, জ্ঞাতিগোষ্ঠী সকলে। ভুবন-ভোলানো সেই মনোহর রূপ দেখে সকলেই আনন্দে নাচতে লাগলেন। গোপালের করুণা দেখে কেউবা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গোপালের সামনে মূর্ছিত হ'য়ে পড়লেন।

ব্রাহ্মণের মূর্ছা ভাঙ্গলে

'সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষী দিল।
বড় বিপ্র ছোট বিপ্রে কন্যাদান কৈল ॥'

সমবেত সকলেই জয়ধ্বনি ক'রে উঠলেন। হাজার কণ্ঠে 'জয় গোপাল! জয় গোপাল!! জয় গোপাল!!!

জয় শ্রীগোপাল জয় মদনমোহন।
যশোদাজীবন জয় রাধিকারমণ ॥

এতক্ষণে যুবক কেঁদে ফেললেন। সে কান্না থামে না। ভরা বন্যায় বাঁধ ভেঙ্গে গেছে।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও কাঁদতে লাগলেন। সে কান্নাও কি আর থামে?

শুধু এই দুই জনারই নয়। সবারই চোখে তখন অশ্রুর দুরন্ত প্রবাহ। মুখে আনন্দের অপার আকুলতা।

সকলেরই অন্তর এক দিব্য অনুভূতিতে ভ'রে উঠলো। দিব্য ভাবে আর আনন্দের পরিপূর্ণতায় আকাশ-বাতাস দশদিক পরিপ্লাবিত হ'য়ে গেলো।

দুই ব্রাহ্মণ গোপালের পদতলে বসলেন। হাত জোড় করলেন। বর চাইলেন।

তুমি এখানেই থাকো। এখান থেকে আর যেয়ো না, ঠাকুর।

নিমেষে লোকে লোকারণ্য হ'ল সেই স্থান। পরিণত হ'ল এক মহা তীর্থে, মহা পুণ্যভূমে!

দেশের রাজা সব কথা শুনে সেখানে এক বড় মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন।

গোপালের নাম হ'ল **সাক্ষীগোপাল।**

এর বহু দিন বাদে—একদিন উৎকলের রাজা পুরুষোত্তমদেব সেই অঞ্চল জয় ক'রে নিজের অধিকারে আনলেন।

তার পরে একদিন সাক্ষীগোপালের কাছে গিয়ে নিয়ে এলেন তাঁকে নিজ রাজ্যে।

সেখানে গোপালের সুন্দর এক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

একদিন রাণী এলেন সেই মন্দিরে গোপালকে দেখতে। গোপালকে তিনি কত সাজে সাজালেন! কত অলঙ্কার পরালেন! রাণীর নাকে ছিল এক মহামূল্য মুক্তা। তাঁর ইচ্ছা হ'ল—সেই মুক্তা তিনি গোপালকে পরিয়ে দেন। কিন্তু তা হবে কি ক'রে? কি ক'রে নাকে ছিদ্র হবে? নাকে ছিদ্র থাকলে নিশ্চয়ই তিনি ঐ মুক্তা গোপালের নাকে পরিয়ে দিতেন! আহা, কেমন মানাতো!

বিষণ্ণ অন্তর নিয়ে রাণী প্রাসাদে ফিরে এলেন। রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন, গোপাল তাঁকে বলছেন, দুঃখ কেন? ছেলে বয়সে মা আমার নাকে ছিদ্র ক'রে বহু যত্নে মুক্তা পরিয়েছিলেন। আজও আমার নাকে সেই ছিদ্র রয়েছে। তোমার ঐ মুক্তা আমার নাকে পরিয়ে দাও।

রাণী স্বপ্নের কথা রাজাকে জানালেন।

রাজা মহোৎসব ক'রে গোপালের নাকে সেই মুক্তা পরিয়ে দিলেন।

সেই অবধি সাক্ষীগোপাল সেখানেই আছেন।

হাওড়া-পুরী রেলপথে পুরীর ঠিক আগের স্টেশনটির নাম সাক্ষীগোপাল।

সাক্ষীগোপাল একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান।

ক্ষীরগ্রামের পূজারী-কন্যা

ক্ষীবগ্রাম বর্ধমান জেলায়।

এই গ্রামে বহু দিনেব একটি কালীমন্দিব আছে।

মন্দিবে নিত্য দেবীব পূজা হয।

পূজাবী মন্দিবেই থাকেন।

দেবী তো নয়, পূজাবীর যেন ছোট্ট মেয়েটি।

সেদিন ভব দুপুব। ..

দেবীব পূজা আবতি শেষ হযেছে। সমাপ্ত হযেছে যথাবীতি দেবীব ভোগ।

দেবীর প্রসাদ পেযে পূজারী মন্দিবেব দাওযায বিশ্রাম কবছেন।

শাঁখা নেবে গো, শাখা?

মন্দিব-সংলগ্ন পথ দিয়ে এক শাঁখাবি চলেছে।

শাঁখা নেবে গো, শাঁখা·· ।

মন্দিবেব পাশেই একটা দীঘি।

সেই দীঘিব ঘাটে আলতা-পবা বাঙাচবণ দুখানি বেখে একটি মেয়ে বসে আছে।

শ্যামবর্ণেব মেয়েটি। কিন্তু রূপেব যেন তুলনা নেই। শ্যামবর্ণেও এত রূপ! মবি মবি।

শাঁখাবি হেঁকেই চলেছে—

শাঁখা নেবে গো, শাঁখা··

শাঁখাবিব কণ্ঠস্বর মেয়েটিব কানে গিয়ে পৌঁছল।

শাঁখাবি, এদিক পানে এসো তো একটিবার।

কে তুমি মা? কি চাই তোমার?

আমাকে শাঁখা পরিয়ে দেবে?

কেন দেবো না, মা? নিশ্চয়ই দেবো। এই·তো আমার কাজ।

শাঁখারি মেয়েটির কাছে গেল। নিজের পছন্দমত শাঁখা পরাল। শাঁখা পরিয়ে কৃতার্থ হ'ল।

বৃদ্ধ শাঁখারি জীবনে অনেক মেয়েকে শাঁখা পরিয়েছে। কিন্তু এমন স্নিগ্ধ পরশ কখনও সে পায়নি। শাঁখা পরিয়ে এত আনন্দ, এত সুখও কোন দিন তার ভাগ্যে জোটে নি। সে জীবনে রূপ দেখেছে অনেকের—কিন্তু এমন মধুব রূপ সে আর দেখে নি।

ভুবন-ভোলানো সেই রূপ দেখে চোখের পলক তার ভিজে উঠলো। স্নিগ্ধ পবশে সারা দেহে আনন্দের শিহরণ জাগলো। গলা ভারী হ'য়ে এলো। কথা যেন আব বেরুতে চায় না।

—এইবার দাম চুকিয়ে দাও। যেতে হবে। না গিয়ে তো পাববো না, মা। বড় গরীব, নেহাৎ গবীব। পয়সা না চেয়ে তাই পারলুম না। কিছুই মনে ক'ব না। একটু থেমে, একটা দীর্ঘশ্বাস বেব ক'বে আবার বললো, হাতে পয়সা থাকলে কি আব চাইতুম? আবাব একটু থেমে, গলা আবও কিছুটা যেন ভাবী ক'রে সে ব'লে চললো, পয়সা না নিয়ে গেলে, ছেলেপিলে উপোসী থাকবে, অনাহারে কান্নাকাটি কববে।

ভাখ, ঐ যে পাশে মন্দির দেখা যাচ্ছে, ওরই পূজারী আমাব বাবা। ওঁর কাছে যাও। গিয়ে আমার কথা ব'লে দাম চেয়ে নিও। ওঁকে ব'লগে, তোমার মেয়ে শাঁখা পরেছে।

বেশ। —সম্মতি জানিয়ে সরল শাঁখারি রওনা হ'ল।

যাবার আগে চকিতে-প্রাণ-কেড়ে-নেওয়া সেই রূপ আর একবার দেখে নিলো।

আর ভাখ—

শাঁখারি থামলো। পিছন ফিরে তাকালো।

যদি তিনি বলেন, পয়সা নেই, তখন ব'ল দেবীর ঝাঁপিতে ছুটো টাকা রয়েছে, তা-ই দিয়ে দিতে বলেছেন।

শাঁখারি মন্দিরে গিয়ে পূজারীর কাছে শাঁখার দাম চাইল।

তোমার মেয়ে শাঁখা পরেছে। দাম দাও।

মেয়ে তো আমার নেই বাপ। তুমি ভুল বলছো।

সে কি বাবা! আমি ভুল বলবো কেন? ঐ যে রাঙা-পেড়ে শাড়ী প'রে দীঘির ঘাটে রাঙা চরণ ছুখানি রেখে চারদিক আলো ক'রে মা আমার ব'সে রয়েছে। তোমার ঐ মেয়েই তো আমার কাছ থেকে শাঁখা চেয়ে নিয়ে পরলো!

না, বাবা। মেয়েটি আর কারও কথা তোমাকে বলেছে।

না গো না। সে তোমার কথাই বলেছে। বলেছে, মন্দিরের পূজারী আমার বাবা। আমি তাঁব মেয়ে। এই গাঁয়ে আর কোনও মন্দির তো নেই যে সেখানকার পূজারীর কথাই বলবে।

তাইতো! কিছুই যে বুঝতে পাবছিনে।

মা আমার আরও বলেছে, দেবীর ঝাঁপিতে ছুটো টাকা আছে; তাই-ই যেন দিয়ে দেন!

তাই তো!

আচ্ছা, ঝাঁপি খুলে দেখই না কেন একবার।

পূজারী ঝাঁপি খুললেন।

সত্যিই তো! ঝাঁপিতে ছুটো টাকাই রয়েছে!

বিস্মিত হলেন পূজারী! হতবাক্!

বিশ্বাস না হয়, ঘাটে গিয়ে দেখবে চল তোমার মেয়েকে!

মন্ত্রমুগ্ধ পূজারী!

তাই চল।

ঘাটে এলেন ছুইজনে।

সেখানে জনপ্রাণীর চিহ্নও নেই।

কই গো, সে কন্যা কই?

শাঁখারি এদিকে দেখে, ওদিকে দেখে। চোখ মুছে নিয়ে আবার দেখে। আবার—

কই! কেউই তো নেই সেখানে!

সরলপ্রাণ শাঁখারি এবার কেঁদে ফেললো।

—কোথায় গেলে মা? কোথায় লুকোলে? একবার এদিকে

এসো। শাঁখাপরা তোমার হাত দুখানি তোমার বাপকে একটিবার দেখাও। তিনি যে বিশ্বাসই করেন না। আমাকে যে শেষে জোচ্চোর বলবেন।

শাঁখারি কাঁদতেই লাগলো।

অকস্মাৎ দীঘির জলের উপর দুখানি শাঁখা-পরা হাত জেগে উঠলো। নিমেষ মধ্যে সে হাত জলের মধ্যে আবার অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

অভূতপূর্ব এই দৃশ্য দেখলো শাঁখারি। দেখলেন পূজারী।

কোনও কথা না ব'লে পূজারী ছুটে এলেন মন্দিরে। দেখাদেখি পূজারীর পিছু পিছু শাঁখারিও এলো ছুটে!

সত্যিই তো! দেবীর হাতে নোতুন শাঁখা।

হ্যা, ঐ শাঁখাই তো পরিয়েছি মাকে।

পূজারী সবই বুঝলেন।

শাঁখারিও সব বুঝতে পারলো।

আনন্দে পূজারী কাঁদতে লাগলেন। শাঁখারিকে জড়িয়ে ধ'রে চীৎকার ক'রে কাঁদতে লাগলেন। সে কান্না থামে না!

শাঁখারিও কাঁদতে লাগলো। তার কান্না কখনও আনন্দে কখনও বা দুঃখে। সে কান্নাও কি আর থামে!

দিবানিশি তোর পূজা করি মা। দেখা পাইনি। কিন্তু দেখা তো পেল এই শাঁখারি। শুধু কি দেখলো! তোকে স্পর্শ করলো, তোকে শাঁখা পরালো! আর, আজ তারই কৃপায়, পুণ্যফলে তোকে দেখতে না পেলেও তোর শাঁখাপরা হাত দুখানি দেখলাম। শাঁখারি, ধন্য তুমি! তুমি ধন্য!

ক্ষমা কর মা, ক্ষমা কর। কিছুই মনে করিস নে। তোকে শাঁখা পরিয়ে এই হতভাগা পয়সা চাইলো! সর্বস্ব দিয়েও যাঁর দেখা কেউ পায় না, এই বুড়ো হতভাগা তাঁর কাছে কিনা পয়সা চাইলো! তুচ্ছ পয়সা চাইলো! হায়রে হতভাগা!

পূজারী শান্ত করতে এলেন শাঁখারিকে।—

কে বলে তোমাকে হতভাগ্য? বহুভাগ্য তোমার, শাঁখারি; তোমার বহু ভাগ্য।

শাঁখারি কাঁদতেই লাগলো। কাঁদতে কাঁদতেই বললো, ধন্য তুমি বাবা, তুমি ধন্য! দেবী তোমাকে বাবা বলেছেন। নিজেকে তোমার মেয়ে ব'লে পরিচয় দিয়েছেন। এমন সৌভাগ্য আর কার? তুমি ধন্য! ধন্য তুমি! বলিহারি তোমার ভাগ্য!

ওগো শাঁখারি, তোমার হাতের শাঁখা আমার মা, যিনি ত্রিভুবনেশ্বরী, তিনি যেচে পরেছেন। হাতে তাঁর এখনও তোমার পরানো সেই শাঁখা! জন্মজন্মান্তরেব সাধনার ফল তোমাব আজ মিলেছে। দেবতা-বাঞ্ছিত ভাগ্য তোমার! তোমাকে প্রণাম ক'রে আজ কৃতার্থ হই।

পূজারী শাঁখারিকে প্রণাম করতে গেলেন।

শাঁখাবি শিউরে উঠলো।

—তুমি আমার মায়ের বাবা। মায়ের বাবা।

আনন্দের চরিতার্থতায় দুজনেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন।

দেখা গেল দুজনেই দেবীর পদতলে লুটিয়ে আছেন।

ক্ষীরগ্রাম ভারতের একটি পীঠস্থান।

ক্ষীরচোরা গোপীনাথ

মাধবেন্দ্র পুরী।

তাঁর মতো ভক্ত আর দেখা যায় না। বিরল বললেই হয়। কৃষ্ণের গায়ের রঙ ছিল নতুন মেঘের মতো। আকাশে নতুন মেঘ দেখলেই মেঘকে কৃষ্ণ মনে ক'রে আবেশে মাধবেন্দ্র জ্ঞান হারাতেন।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দ্রের শিষ্য ছিলেন। গয়াধামে ঈশ্বরপুরী নিমাইকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। সেই ঈশ্বরপুরী। শান্তিপুরের প্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্যও মাধবেন্দ্রের শিষ্য।

মাধবেন্দ্র দিবানিশিই কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। দিবারাত্রির ভেদাভেদ তাঁর নেই। যেখানে সেখানে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েন।

তিনি একদিন বৃন্দাবনে এলেন। নানা জায়গা ঘুরে শেষে এলেন গিরি গোবর্ধনের কাছে। গোবর্ধন পরিক্রমা ক'রে তিনি গোবিন্দকুণ্ডে স্নান করলেন। তারপরে সন্ধ্যাকালে এক বৃক্ষতলে আশ্রয় নিলেন।

এমন সময়ে একটি গোপবালক তাঁর কাছে এলো। এলো এক ভাঁড় দুধ নিয়ে।

পুরী, দুধ এনেছি খাও। বলি, তুমি চেয়ে খাওনা কেন? আর, দিনরাত ব'সে ব'সে কার ধ্যানই বা কর, শুনি?

স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণের বালক। কিন্তু মরি মরি! এত রূপ! এত দ্যুতি চোখে মুখে সর্বাঙ্গে।

বালকের মনোমোহন রূপ দেখে পুরী অবাক হ'য়ে গেলেন। তিনি মুগ্ধ হলেন। তার মধুর কথায় ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হ'ল। তিনি বালকের মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন।

ভাবাবেশ কেটে গেলে পুরী জিজ্ঞাসা করলেন,—কে তুমি বালক? কোথায় থাক? কেমন ক'রে জানলে আমি উপোসী রয়েছি?

আমি এক গোয়ালার ছেলে। এই গাঁয়েই আমি থাকি। এ

গাঁয়ে কেউ উপোসী থাকে না। কেউ চেয়ে খায়। আর, যে চায় না, আমিই তার আহার জোগাই। এখানে জল নিতে এসেছিলেন মেয়েরা। তাঁরা তোমায় দেখে আমার হাতে এই দুধ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তুমি দুধ খাও। আমি আবার এসে ভাঁড় নিয়ে যাবো।

বালক চ'লে গেলো।

যতদূর দৃষ্টি যায় তন্দ্রাচ্ছন্ন বিহ্বল দৃষ্টি মেলে পুরী বালকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার ভুবনসুন্দর মনোহর রূপ দেখতে লাগলেন। যখন দেখা আর গেল না, তার পরেও বহুক্ষণ পর্যন্ত চোখের সামনে সেই মধুরতম রূপ ভেসে রইলো।

পুরী ভাবতে লাগলেন—কে এই বালক! এমন রূপ তো আর দেখিনি। আর কণ্ঠস্বর? সে যেন মধুমুরলীব ধ্বনি। কথায় অমিয় ঝরে। এ কে?

ক্রমে প্রকৃতিস্থ হলেন মাধবেন্দ্র। তিনি দুধ খেয়ে ভাঁড় ধুয়ে রাখলেন। শেষে পথের দিকে চেয়ে বালকের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন—কখন আবার সে আসবে? কখন আবার তার দেখা মিলবে?

বালক এলো না।

সারা রাত জেগে পুরী কৃষ্ণনাম করতে লাগলেন।

—হে কৃষ্ণ, হে দীনদয়াল, হে গোবিন্দ······

রাত্রিশেষে তন্দ্রা এলো। মাধবেন্দ্র স্বপ্ন দেখলেন—

সেই বালক গোপাল-বেশে ধীরে ধীরে তাঁর কাছে এলো। মাথায় শিখিপুচ্ছ, হাতে মুরলী, পায়ে নূপুর। সে এসে তাঁর হাত ধরলো। তাঁকে নিয়ে গেল এক কুঞ্জবনে। সে বললো, আমার নাম গোপাল। আমিই একদিন এই গোবর্ধন ধারণ করেছিলাম। অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রনাভ আমায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার বহু পরে মুসলমান আক্রমণের কালে আমার এক সেবক আমাকে লুকিয়ে রাখে এইখানে। সেই অবধি আমি এই কুঞ্জেই প'ড়ে আছি। গ্রীষ্ম,

বর্ষা, শীত সবই আমার দেহের উপর দিয়ে সমানে চ'লে যায়। আমি খুবই কষ্ট পাই। ভালোই হ'ল, মাধব, তুমি এলে। তুমি এক কাজ কর। গাঁয়ে গিয়ে লোকজন ডেকে আন। তাদের সাহায্যে আমাকে এখান থেকে উদ্ধার কর। পরে ঐ গোবর্ধন পাহাড়ের উপরে নিয়ে সেখানেই আমাকে রাখবার আয়োজন কর। সেখানেই আমার প্রতিষ্ঠা কর। বহুদিন যাবত তোমার পথ চেয়ে রয়েছি। কবে আমার মাধব এসে আমায় উদ্ধার করবে। তোমার প্রেমে আমি বাঁধা। মাধব, তুমি আমার সেবা কর।

এই ব'লে বালক কোথায় মিলিয়ে গেলো।

তন্দ্রা ছুটে গেলো। মাধব অনুতাপ করতে লাগলেন। হায়, হতভাগ্য আমি! প্রাণসর্বস্ব হৃদয়-বিহারীকে চিনতেই পারলাম না!

মাধবেন্দ্র ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন। গড়াগড়ি দিতে লাগলেন।

হায় হায়! কোথায় তুমি, গোপাল? দেখা দিয়ে ছলনা করলে! আমি তো দুধ চাইনি, গোপাল। চেয়েছি জীবনভোর তোমাকে। কোথায় তুমি? হে দীন-দয়ার্দ্রনাথ, হে প্রভু, হে মথুরানাথ, হে দয়াল, তোমাকে দেখবো কবে, কোথায়? তোমাকে না দেখে আমি অস্থির হয়েছি। বল। তুমি বল। হে প্রভু, কি করবো আমি, কি করবো?

এইভাবে কিছুক্ষণ আকুল হ'য়ে কেঁদে তিনি মনস্থির করলেন—

আমি তোমার আদেশ পালন করবো, প্রভু। আমি তোমার আদেশ পালন করবো।

রাত্রি প্রভাত হ'ল।

মাধবেন্দ্র গাঁয়ে গিয়ে লোকজন ডেকে আনলেন।

তোমাদের গাঁয়ের ঈশ্বর গোবর্ধনধারী এই কুঞ্জেই রয়েছেন। চল, সকলে মিলে তাঁকে উদ্ধার করি।

আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে সবাই চললেন। তাঁরা পথ কাটতে কাটতে একেবারে কুঞ্জের অভ্যন্তরে পৌঁছলেন। স্বপ্ননির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে সবাই দেখতে পেলেন, ঘাসের নীচে গোপাল রয়েছেন।

সকলে অবাক হ'য়ে গেলেন।

ধীরে অতি সন্তর্পণে আবরণ অপসারিত করা হ'ল। সর্বাঙ্গসুন্দব ঠাকুর তখন সবাইকে দর্শন দিলেন।

অপার উল্লাসে কেউ নাচতে লাগলো। কেউ গাইতে লাগলো। আনন্দের আকুলতায় কাবও বা দুচোখ বেয়ে জলধারা ছুটলো।

ঠাকুর বিশ্বম্ভর। তাঁকে উঠিয়ে আনা বড় সহজ কথা নয়। বহুলোক একত্রে ধরাধরি ক'রে তবে তাঁকে নিয়ে এলেন পাহাড়েব উপর। সেখানে তৈরী হ'ল প্রস্তরসিংহাসন।

সেই পাথরের সিংহাসনেই তাঁর প্রতিষ্ঠা হ'ল।

গ্রামবাসীরা গোবিন্দকুণ্ডের জল এনে গোপালকে স্নান করালেন। অভিষেক হবে।

নানাজাতীয় বাজনা বাজতে লাগলো। মেয়েরা গাইতে লাগলেন। নাচতে লাগলেন পুরুষেবা। ফুলে ফুলময় হ'য়ে গেল গোটা পাহাড়। শুরু হ'ল মহোৎসব। বিপুল সমাবোহ।

এমন ধাবা সমাবোহেব মধ্যেই মাধবেন্দ্র গোপালের অভিষেক করলেন।

মথুরায় বহু ধনীব বাস। 'এক রাজা গোপালের বিরাট মন্দিব নির্মাণ ক'রে দিলেন। সেখানকাব এক একজন শ্রেষ্ঠী এক একটি দ্রব্য দিলেন। এক একজনে গোপালকে এক একটি অলঙ্কাবে সাজালেন।

অল্প দিনের মধ্যে সহস্র গাভীও এসে জুটলো। গোপালের গোহাল গাভীতে ভ'রে গেল। গো না থাকলে গোপাল থাকবেন কেমন ক'বে? ননী বিহনে ননীগোপাল?

মাধবেন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত এই গোপাল মন্দির অচিরে দেশ-বিখ্যাত হ'য়ে পড়লো।

জয় গোপাল! জয় গোপাল! জয় গোপাল!

বছর দুই কেটে গেলো।

পুরী গোঁসাই একদিন আবার স্বপ্ন দেখলেন।—

গোপাল তাঁকে বলছেন, পুরী, আমার শরীরে বড়ই জ্বালা। কিছুতেই আমার গরম কমছে না। যদি কর্পূর আর মলয়চন্দন এনে আমাব সর্বাঙ্গে লেপন করতে, তবেই আমার তাপ জুড়াতো। অঙ্গ আমার শীতল হ'ত। নীলাচলে চন্দন মেলে। ত্বরিতে সেখানে যাও। আমার জন্যে চন্দন নিয়ে এসো।

গোপাল কর্পূব চন্দন পরবেন! তাঁর দেহ শীতল হবে। তিনি সুখী হবেন! আদেশ কবেছেন স্বয়ং গোপাল!

মাধবেন্দ্রের আনন্দ আর ধরে না।

ছুটে চল্, ওরে, ছুটে চল্।

খুসীর আকুলতায় দেহ-তরী অবাধে ছুটল। যেন নিমেষেই পৌঁছলেন শান্তিপুরে। অদ্বৈত আচার্যেব গৃহে উপস্থিত হ'য়ে তাঁকে দীক্ষা দিয়ে আবার ছুটলেন।

ছুটে চল্, ছুটে চল্, গোপাল চন্দন-কর্পূর মাখবেন যে!

অনতিবিলম্বে মাধবেন্দ্র বেমুনাতে এসে উপস্থিত হলেন। রেমুনা উৎকলের অন্তর্গত।

বেমুনায় গোপীনাথের মন্দির।... ...

দেশেব কে না জানে এই মন্দিরেব নাম? কে না শুনেছে মন্দিব-দেবতা গোপীনাথের অজস্র লীলা-কাহিনী?

মাধবেন্দ্র এলেন এই মন্দিবে। দেখলেন গোপীনাথকে। স্থিব থাকতে পারলেন না। ভাবে বিহ্বল হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। ঠাকুব, ওগো ঠাকুর,... .

গোপীনাথের সেবার সৌষ্ঠব পুরীকে মুগ্ধ করলো। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। মনে করলেন, নিশ্চয়ই এখানে ভোগেরও উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে। ইচ্ছা হ'ল, এখানে যেমন যেমন ভোগ হয় সব শুনে রাখি। বৃন্দাবনে ফিরে গিয়ে ঠিক তেমনটি ক'রেই আমার গোপালকে ভোগ নিবেদন করবো। গোপাল! আমার গোপাল!

যথাসময়ে ভোগ আরতি শুরু হ'ল। বাজতে লাগলো কাঁসর-ঘণ্টা······

এক ব্রাহ্মণ পাশেই ছিলেন। ভক্তিমান ব'লে মনে হ'ল।

প্রভু, ঠাকুরের কি কি ভোগ দেওয়া হয় এখানে, অনুগ্রহ ক'রে বলবেন ? বড় সাধ হয়েছে শুনতে।

সন্ধ্যায় অমৃতকলি নামে ক্ষীরভোগ দেওয়া হয়। বারোখানি ভাঁড়ে এই ক্ষীর সাজিয়ে রাখা হয়। এই ক্ষীর গোপীনাথের ক্ষীর নামে প্রসিদ্ধ। 'পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাঁহা নাহি আর।'

অমৃতকলি ক্ষীর! না জানি সে কেমন জিনিস! কেমন স্বাদ তার! সামান্য পরিমাণ ক্ষীর প্রসাদ যদি পেতাম, তবে তা' আস্বাদন ক'রে দেখতাম! আর ঠিক তেমন ক্ষীরই তৈরী ক'রে আমার গোপালকে নিবেদন করতাম। সে কেমন হোতো! আহা!

কিন্তু সে হবে কেমন ক'রে? চাইতে তো আমি পারবো না। জীবনে কোনও দিনই তো কিছু চাইনি কারুর কাছে। তবে ?

পুরীর অযাচক বৃত্তি। কেউ সানন্দে কিছু দিলে তিনি খান। নয়তো উপবাস। দিবানিশি তিনি প্রেমামৃত পান করেন। তাতেই তিনি তৃপ্ত। ক্ষুধাতৃষ্ণার বোধ তাঁর নেই। কিন্তু ক্ষীরে কেন হঠাৎ তাঁর অভিলাষ হ'ল? অযাচক সন্ন্যাসীর যাচ্ঞা প্রবৃত্তি? ছি ছি, শেষে দ্রব্যে লোভ!

লজ্জিত হ'লেন পুরী গোঁসাই। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ········ বারংবার কৃষ্ণ স্মরণ করতে লাগলেন।

পূজা আরতি শেষ হ'ল।

পুরী মন্দিরের বাইরে নিভৃতে ব'সে রইলেন। ক্ষীরের কথা আর কিছু বললেন না। সে বিষয়ে নীরব রইলেন।

রাত্রি অধিক হয়েছে। গ্রামের হাট ভেঙ্গে গেছে। চ'লে গেছে দোকানী পসারী। হাট একেবারেই জনশূন্য। ধীরে ধীরে সেই

নির্জন নিস্তব্ধ শূন্য হাটে মাধবেন্দ্র চ'লে এলেন। শুরু করলেন প্রাণভরে কৃষ্ণ-কীর্তন।

হে কৃষ্ণ, হে দীনদয়াল, হে গোবিন্দ……

সেদিন রাত্রে পূজারী স্বপ্ন দেখলেন—

গোপীনাথ বলছেন, পূজারী ওঠো। দুয়ার খোলো। শূন্য হাটে মাধবেন্দ্র পুরী ব'সে নাম করছেন। অযাচক সন্ন্যাসী তিনি। তিনি মহাভক্ত। তাঁর জন্যে একখানি ক্ষীর রেখেছি। আমার ধড়ার আঁচলে তা লুকানো আছে। শীঘ্র গিয়ে তাঁকে এই ক্ষীরভাণ্ড দিয়ে এসো।

ঘুম ভেঙ্গে গেলো পূজারীর। উঠে বসলেন। দুয়ার খুলে এলেন গোপীনাথের কাছে। দেখি আঁচল।

জয় গোপীনাথ!

এই তো আঁচলের আড়ালেই রয়েছে একখানি ক্ষীর। এ কি অলৌকিক কাণ্ড! অভাবনীয় ব্যাপার!

বিস্মিত পুলকিত পূজারী!

মন্ত্রচালিতের মতই তিনি ক্ষীরভাণ্ড নিয়ে মন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। এলেন হাটে।

মাধবপুরী নামে সন্ন্যাসী কে আছ এখানে? দেখ, দেখ, তোমার জন্যেই গোপীনাথ ক্ষীর চুরি ক'রে রেখেছেন। এসো। ক্ষীর নাও। মাধবপুরী! মাধবপুরী!! মাধবপুরী!!!

পুরী এলেন। সসঙ্কোচে নিজের পরিচয় দিলেন।

পূজারী তাঁকে ক্ষীরভাণ্ড দিয়ে প্রণাম করলেন।

তোমার মতো ভাগ্যবান ত্রিভুবনে আর নেই। ধন্য তুমি! ধন্য! তোমার জন্যেই আমাদের গোপীনাথ আজ হ'তে 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' নামে খ্যাত হলেন। এমন ভাগ্য আর কার হয়েছে? কবে? কোথায়?

প্রেমে আবিষ্ট হলেন পুরী। লুটিয়ে পড়লেন ভূমিতে। গড়াগড়ি দিতে লাগলেন।

হে গোপীনাথ, হে দীনদয়ার্দ্রনাথ···

ক্রমে সম্বিৎ ফিরে এলো। প্রকৃতিস্থ হলেন মাধবেন্দ্র।—

ঠাকুর আমার জন্যে ক্ষীর চুরি করেছেন। অচিরে এই বার্তা চারিদিকে প্রচারিত হবে। লোকে দেখতে আসবে আমাকে। আমার প্রতিষ্ঠা হবে। অভিমান আসবে হয়তো।

ঠাকুর, অপরাধ নিও না। আমি পালিয়ে যাই। এখুনি। তুমি অন্তর্যামী। হৃদয়বিহারী তুমি। এ কাঙালের অন্তরের অভিলাষ তুমি জানতে পেরেছ। সে অভিলাষ পূরণ করতে তুমি চুরি করতেও দ্বিধা করলে না। লজ্জা পেলে না। এই কথাই প্রচারিত হোক সর্বত্র। রাষ্ট্র হোক তোমার এই কাহিনী। তোমার এই অপার মহিমা। প্রতিষ্ঠা হোক তোমার। দীনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী ওগো ঠাকুর, তোমারই হোক জয়। তোমার জয় হোক।

গোপীনাথকে প্রণাম ক'রে কাঁদতে কাঁদতে হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে মাধবেন্দ্র নিভৃতে রেমুনা ত্যাগ করলেন।

হে কৃষ্ণ, হে দীনদয়ার্দ্রনাথ, হে গোবিন্দ, হে গোপীনাথ,···

মাধবেন্দ্র নীলাচলে এলেন।

দর্শন করলেন তীর্থপতি জগন্নাথকে।

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী নীলাচলে এসেছেন। নীলাচল যেন ভেঙ্গে পড়লো। অগণিত লোক মহাপুরুষকে দেখতে এলো।

প্রতিষ্ঠা যে চায়, সে পায় না। যে চায় না, প্রতিষ্ঠা তাকেই আঁকড়ে ধরে।

এই প্রতিষ্ঠার ভয়ে তিনি রেমুনা ছেড়েছেন। এই প্রতিষ্ঠার ভয়ে তিনি নীলাচল হ'তেও পালাতে চাইলেন।

পালালেই হ'ল? মলয়জ চন্দন চাই। তাঁর গোপাল কর্পূর-চন্দন পরবেন। কর্পূর-চন্দনে চর্চিত হবে তাঁর কম অঙ্গ, দেহ তাঁর শীতল হবে। তিনি পুলকিত হবেন।

থাকতে হ'ল। যাওয়া আর হ'ল না। চন্দন তাঁর চাই-ই। চন্দনই হ'ল বন্ধন।

যত মোহান্ত আছেন নীলাচলে, সবের দ্বারে দ্বারে গিয়ে পুরী চন্দনের বৃত্তান্ত শোনালেন।

আমার গোপাল চন্দন চেয়েছেন। আপনারা তার ব্যবস্থা করুন।

নিশ্চয় নিশ্চয়। এ সৌভাগ্য কে হারাতে চায়? চাইবে কেন? আপনি আমাদের চন্দনের কথা জানালেন। আমরা ভাগ্যবান।

চন্দনবন উৎকলরাজের অধিকারে। রাজা না দিলে কেউ চন্দন নিয়ে দেশান্তরে যেতে পারবে না। অন্য কেউ নিলেও কর দিতে হবে।

মোহান্তরা সবাই রাজার কাছে গিয়ে চন্দনের ব্যবস্থা ক'রে আনলেন। চন্দন ও সম্বল বইবার লোকেরও ব্যবস্থা করলেন।

মাধবেন্দ্র চন্দন নিয়ে চললেন।

তার গোপাল পরবেন।

আবার রেমুনা।···

গোপীনাথ তাঁর হৃদয় হরণ করেছেন। গোপীনাথই তাঁকে নিয়ে এলেন। নিয়ে এলেন শ্রীমন্দিরে।

মাধবেন্দ্র দর্শন করলেন শ্রীগোপীনাথকে। প্রেমাবেশে অনেকক্ষণ নৃত্যগীত করলেন।

পুরী সে রাত্রে দেবালয়েই রইলেন। ক্ষীর প্রসাদ পেয়ে তিনি মন্দিরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাত্রিশেষে পুরী স্বপ্ন দেখলেন। সে এক মধুর স্বপ্ন।

গোপাল বলছেন. মাধব, শোন। আমি চন্দন পেয়েছি। তুমি কর্পূরের সঙ্গে চন্দন মিশিয়ে গোপীনাথের অঙ্গেই লেপন কর। ছাখ, আমি আর গোপীনাথ এক, অভিন্ন। গোপীনাথকে চন্দনে চর্চিত করলে আমার অঙ্গই শীতল হবে জেনো। তুমি দ্বিধা ক'র না।

নিদ্রা টুটে গেলো। আনন্দে আত্মহারা মাধব সারা রাত্রি ঠাকুরের করুণার কথাই ভাবতে লাগলেন। ঠাকুর, আমার ঠাকুর, অধমের প্রতি তোমার এত করুণা!

ভোর না হ'তেই পুরী সেবকগণের দুয়ারে উপস্থিত হলেন। নিবেদন করলেন সব বৃত্তান্ত।

প্রভুর আজ্ঞা হয়েছে। এই কর্পূর চন্দন গোপীনাথের গায়েই লেপন করতে হবে। এঁকে চন্দন পরালেই গোপাল শীতল হবেন। মহাভাগ্য আমাদের। আসুন। আসুন।

গোপীনাথ চন্দন পরবেন জেনে সবাই পুলকিত হলেন।

প্রত্যহ গোপীনাথের গাত্রে কর্পূর চন্দন লেপনের ব্যবস্থা হ'ল। সবাই সমারোহ ক'রে চন্দন পরাতে লাগলেন।

যতদিন চন্দন শেষ না হ'ল ততদিন পুরী গোঁসাই রেমুনাতেই অবস্থান করলেন।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যখন সদলে রেমুনা হ'য়ে নীলাচলে যাচ্ছিলেন, তখন রেমুনায় শ্রীগোপীনাথকে দর্শন করেছিলেন। সবাইকে এই ক্ষীরচোরা শ্রীগোপীনাথের কাহিনী শুনিয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, পুরী গোঁসাই-এর মতো ভাগ্যবান আর কে আছে?

রেমুনায় গোপীনাথের মন্দির এখনও রয়েছে।

এখনও সেখানে এই কাহিনী স্মরণ ক'রে অগণিত লোক সমবেত হন।

—(:০:)—

রামপ্রসাদ

হালিশহর। ভাগীরথীতীরে হালিশহর।......

আগেকার নাম কুমারহট্ট।

কুমারহট্ট এক প্রসিদ্ধ জনপদ।

বহু মহাপুরুষের চরণধূলি এখানকার মাটির বুকে মিশে রয়েছে। বহু খ্যাতনামা লোকের এখানে হয়েছে আবির্ভাব।

ঈশ্বরপুরী। গয়াধামে ঈশ্বরপুরী শ্রীচৈতন্যদেবকে মন্ত্রদীক্ষিত করেছিলেন। সেই ঈশ্বরপুরী। ঈশ্বরপুরী কুমারহট্টের অধিবাসী ছিলেন। হালিশহরে রয়েছে চৈতন্য ডোবা। এই চৈতন্য ডোবাই তাঁর পৈতৃক ভিটা।

শ্রীচৈতন্য গুরুদেবের জন্মভিটা দেখতে একদা কুমারহট্টে এসে-ছিলেন। গুরুদেবের প্রতি অসীম শ্রদ্ধায় নিজের উত্তরীয় প্রান্তে বেঁধে নিয়েছিলেন একমুষ্টি ধূলি। সেই অবধি যে বৈষ্ণবই এখানে এসেছেন তিনিই পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে এক মুষ্টি ধূলি সংগ্রহ ক'রে নিয়েছেন। এইভাবেই এখানে সৃষ্টি হয়েছে ডোবার। এরই নাম চৈতন্য ডোবা।

শ্রীবাস পণ্ডিত। শ্রীবাস পণ্ডিত তখন নবদ্বীপে থাকতেন। তাঁরই আঙিনায় শ্রীচৈতন্য দিবানিশি ভক্তজন সঙ্গে কীর্তনে মেতেছেন। শ্রীবাস পণ্ডিত অধিবাসী ছিলেন কুমারহট্টের।

বাসুদেব ঘোষ বহু কীর্তনপদ লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। পদাবলী সাহিত্যে তিনি বাসু ঘোষ নামে পরিচিত। বাসু ঘোষও কুমারহট্টের অধিবাসী।

এই কুমারহট্টে বাস করতেন রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদ সেন।

বেশী দিনের কথা সে নয়। রামপ্রসাদ নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন।

রামপ্রসাদ ছিলেন মা নামে পাগল। তাঁর কণ্ঠে দিবানিশি কেবল মা মা মা।

রামপ্রসাদের মা সবাকার মা। জগৎ-জননী। জগদীশ্বরী।

মূর্তি গড়িয়ে এই মায়েরই তিনি নিত্য পূজা করতেন।

ইনি কালী।

এই মাতৃসাধনায়—কালীসাধনায়—রামপ্রসাদ দিবানিশি মগ্ন থাকতেন। সিদ্ধ হয়েছিলেন সাধনায়। মা তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন।

রামপ্রসাদ নিজে একজন বড় গায়কও ছিলেন। তিনি নিজে গান লিখে সেই গান গেয়ে সারা দেশ রাঙিয়ে, মাতিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

আজও তাঁর গান রামপ্রসাদী গান নামে পরিচিত। আর, যে বিশেষ সুরে এই সব গান গাওয়া হয়, তা রামপ্রসাদী সুর ব'লেই চ'লে আসছে।

আজ রামপ্রসাদ, রামপ্রসাদের লেখা গান আর রামপ্রসাদী সুর সব মিশে একাকার হ'য়ে গিয়েছে।

লেখক, গান ও সুর।

যৌবনে জীবিকার জন্যে রামপ্রসাদকে কলকাতায় এক ধনীর সেরেস্তায় মুহুরীর কাজ নিতে হয়েছিল। মুহুরীর কাজ করতেন। কিন্তু মন প'ড়ে থাকত 'শ্যামাপদ নীলকমলে।' দিবানিশি শুধু মা মা মা। কেবল 'কালীপদ ভাবনা।'

মাঝে মাঝে রামপ্রসাদ এত তন্ময় হ'য়ে যেতেন যে কোথায় কি লিখছেন তার ঠিকঠিকানা থাকতো না। হয়তো হিসাবের খাতাতেই গান লিখে বসলেন। কত গান লিখেছেন সেরেস্তার খাতায়!

আমায় দে মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী॥
আমি বিনা মাহিনার চাকর।
কেবল চরণ-ধুলার অধিকারী॥

এই জাতীয় কত গান।

একদিন সেরেস্তায় এলেন মনিব। ডাকলেন রামপ্রসাদকে। আবার ডাকলেন। তবুও শুনতে পেলেন না। তন্ময় হ'য়ে লিখেই চলেছেন হিসাবের খাতা।

মনিব দেখতে এলেন কি লিখছে রামপ্রসাদ এত মনোযোগের সঙ্গে। দেখলেন। পড়লেন।

না, এ হিসাব-নিকাশ নয়। সেরেস্তার কোনও কাজের কথাও নয়।

অপূর্ব সুন্দর গান !

মনিব মুগ্ধ হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, রামপ্রসাদ যে-সে লোক নন। তিনি একজন উচ্চস্তরের ভাবুক এবং স্বভাব-কবি।

গুণগ্রাহী মনিব নিষ্কৃতি দিলেন রামপ্রসাদকে। অব্যাহতি দিলেন মুহুরীর কাজ থেকে। ব্যবস্থা করলেন মাসিক বৃত্তির।

অর্থের ভাবনা থেকে মুক্ত হলেন রামপ্রসাদ। এখন থেকে তিনি অহর্নিশ পঞ্চবটীতলায় সাধনায় নিমগ্ন থাকেন। মাতৃসাধনায়। অবসর পেলেই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে গান বাঁধেন আর সেই গান গেয়ে চলেন। আকাশ-বাতাস মুখরিত হয় সেই সুরঝঙ্কারে।

কখনও মাকে নিয়ে তাঁর আবদার। কখনও মাকে চোখ রাঙিয়ে ধমকানো। কখনও বা তাঁর ক্ষণিক বিরহে আকুল কান্না। কখনও নিছক অভিমান, কখনও ঝগড়া-বিবাদ। কখনও বা মায়ের রূপটি দেখে একেবারে আত্মহারা। আবার কখনও বা বিভ্রান্ত দেশবাসীর কাছে শ্যামশ্যামা সমন্বয়ের মধুর তত্ত্ব ঘোষণা।

তিনি গাইলেন—

(১)

এবার কালী তোমায় খাব।

* * *

গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় যে মা-খেকো ছেলে।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই দুটোর একটা ক'রে যাব॥

* * *

(২)

ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখো এলোকেশী।
দ্বারে দ্বারে যাব ভিক্ষা মাগি খাব,
মা মলে কি তার সন্তান বাঁচে না॥

(৩)

বড়াই করো কিসে গো মা বড়াই করো কিসে।
আপনি ক্ষ্যাপা পতি ক্ষ্যাপা থাকো ক্ষ্যাপা সহবাসে॥
তোমার আদিমূল সকলি জানি, দাতা তুমি কোন পুরুষে।
মাগী-মিন্সে ঝগড়া করে রইতে নার আপন বাসে।
মাগো তোমার ভাতার ভিক্ষা করে ফেরে কেন দেশে দেশে॥

(৪)

ভোলানাথের ভুল ধরেছি বলব এবার যারে তারে।
পিতা হয়ে মায়ের চরণ হৃদে ধরে কোন বিচারে॥

* * *

মায়েব ধন সন্তানে পায় সে ধন নিলে কোন বিচারে।
আপন ভাল চায় যদি সে চরণ ছেড়ে দিক্ আমারে॥
শিবের দোষ বলি যদি বাজে আপন গা'র উপরে।
রামপ্রসাদ বলে ভয় করিনে (মার) অভয় চরণের জোরে॥

(৫)

* * *

কালো রূপ অনেক আছে, এ বড় আশ্চর্য কালো।
(যাঁরে) হৃদ্ মাঝারে রাখলে পরে হৃদয়-পদ্ম করে আলো॥

* * *

(৬)

মন ক'রো না দ্বেষাদ্বেষি যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী।
আমি বেদাগম পুরাণ করিলাম কত খোঁজ তালাসি,
ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম—সকল আমার এলোকেশী।
শিবরূপে ধর শিঙা কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
ওমা, রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি।

(৭)

*   *   *

কালী হ'লি মা রাসবিহারী, নটবর বেশে বৃন্দাবনে।

এই জাতীয় কত গান! কত গান লিখেছেন রামপ্রসাদ! অন্তরের অন্তস্থল হ'তে উত্থিত প্রবল অনুভূতির সংযোগে তাঁর সব গানই প্রাণময়। তাঁর সব গানেই কেবল নিজের কথা, প্রাণের কথা। 'আয় মা দুটো কথা বলি'—এই-ই হোলো তাঁর গানের মূল কথা।

এই রামপ্রসাদ।

তাঁর সময়ে কুমারহট্টে বাস করতেন আজু গোঁসাই। তিনি ছিলেন একজন বৈষ্ণব সাধু। ইনিও দ্রুত গান লিখতে পারতেন।

রামপ্রসাদ কোনও গান লিখলে আঁজু গোসাই গান লিখেই তার জবাব দিতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মাঝে মাঝে এই দুই জনকে একত্রে বসিয়ে এই দুই কবির সঙ্গীত-যুদ্ধ উপভোগ করতেন।

একদিন আঁজু গোঁসাই গঙ্গাস্নান ক'রে ফিরে আসছেন। হাতে কমণ্ডলু। তাতে গঙ্গাজল। পথে হঠাৎ রামপ্রসাদ ছুঁয়ে ফেললেন তাঁকে। গোঁসাই অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। একটা মাতাল তান্ত্রিক তাঁকে ছুঁয়ে অপবিত্র করল! আবার গঙ্গাস্নান করলেন। কমণ্ডলুর জল ঢেলে আবার গঙ্গাজল ভ'রে নিয়ে এলেন।

বাড়ী ফিরে এলেন গোঁসাই। পূজা করতে বসবেন। ঢাললেন কমণ্ডলু থেকে গঙ্গাজল।

কিন্তু এ কি! এ-তো গঙ্গাজল নয়! এ-যে এক কমণ্ডলু সুরা!

গোঁসাই-এর ভুল ভাঙ্গলো। তিনি বুঝতে পারলেন, রামপ্রসাদ যে সে লোক নন। তিনি একজন মহাসাধক।

রামপ্রসাদ গাইলেন—

আমি সুরাপান করি না, সুধা খাই জয় কালী ব'লে।
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে ॥

এই হলেন রামপ্রসাদ।

সাধক রামপ্রসাদ পরম নির্ভরতায় গেয়েছেন—

ডুব দে রে মন কালী বলে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে ॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু-চার ডুবে ধন না মিলে।
তুমি দম-সামর্থ্যে ডুব দিয়ে যাও কুলকুণ্ডলিনীর মূলে ॥

তিনি নিজে এই রত্ন আহরণ ক'রে তাঁর দেশবাসীর মধ্যে বিতরণ করেছেন। তাই বাঙালী অতীতেও যেমন গেয়েছেন রামপ্রসাদের গান, বর্তমানেও যেমন গেয়ে চলেছেন তাঁর গান, ভবিষ্যতেও তেমনই গেয়ে যাবেন তাঁরই গান। যুগে যুগে লক্ষজন কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হবে, অনুরণিত হ'য়ে ফিরবে তাঁরই আত্মনিবেদনের সুর।—

কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন তো।
রামপ্রসাদের এই আশা মা অন্তে থাকি পদানত ॥

মহাসাধক রামপ্রসাদ নিজের মৃত্যুক্ষণ পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন। মৃত্যুলগ্ন আসন্ন জেনে তিনি গঙ্গাবক্ষে অবতরণ করেন ও বক্ষজলে দাঁড়িয়ে

'ও মা আমার দফা হোলো রফা'

গানটি গাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হয়।

এই সাধক রামপ্রসাদ!

মা জগদম্বা।........
তিনি ভক্তবৎসলা ভক্তহৃদিবাসিনী।
রামপ্রসাদের কণ্ঠে শুধু মা, মা, মা।

তাঁর ডাকে মা একদিন সাড়া দিলেন। এলেন।

শুধু এলেন না। রামপ্রসাদের অলক্ষিতে তাঁরই আঙিনায় পদচারণা করলেন। গৃহকর্ম করলেন।

রামপ্রসাদের বাড়ী সাধারণ ঘর।

রামপ্রসাদ নিজেই তাঁর ঘরের বেড়া বাঁধবেন। বেড়া বাঁধবেন বেত দিয়ে। কাটারি ও বেত হাতে তিনি বেড়া বাঁধতে গেলেন।

একা একা এ কাজটি চলে না। বেড়ার অপর দিক হ'তে কাউকে বাঁধন ফিরিয়ে দিতে হয়। অপর কেউ নেই বাড়ীতে। অগত্যা ডাকলেন নিজের মেয়েকে। মেয়ে তাঁর বাঁধনের বেত ফিরিয়ে দেবেন।

মা, আয়তো।

মেয়ে বাপের ডাক শুনতে পেলেন না। তিনি ছিলেন একটু দূরে গৃহকাজে ব্যস্ত।

মা, মাগো! আয় না একটিবার। আমার কাজে একটু সাহায্য করবি!

সে ডাকও পৌঁছলো না মেয়ের কানে।

রামপ্রসাদ বারবার ডাকতে লাগলেন।

কই মা, কতক্ষণ ব'সে থাকব তোর জন্যে? তুই কি আর আসবি নে? মা, মাগো!

নিজের মেয়ে সে ডাক শুনতে না পেলেও শুনতে পেলেন তিনি যাঁকে রামপ্রসাদ জীবনভোর ডেকে ডেকে চলেছেন। সেই মা। নিত্য যাঁর পূজা করেন—সেই গৃহ-অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালী।

ভক্তের ব্যাকুল আহ্বান তাঁকে চঞ্চল ক'রে তুলল। পারলেন না স্থির থাকতে। তিনি এলেন।

কিন্তু দেবতারূপে নয়। তিনি এলেন মানুষের রূপটি ধ'রে। রামপ্রসাদের মেয়ে হ'য়ে।

এসেই একটি কথাও না ব'লে ঘরের বেড়ার বাঁধন ফিরিয়ে দিতে লাগলেন।

রামপ্রসাদ তাঁকে দেখতে পেলেন না। দেখবেন কি ক'রে? তিনি বাঁধন ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন বাইরে থেকে। আর সন্দেহ করবার কি-ই বা আছে? নিশ্চয়ই তাঁর নিজের মেয়ে বাঁধন ফিরিয়ে দিচ্ছে। নিজে ডেকেছেন যে তাঁকে বারংবার।

সে এক অপূর্ব কাণ্ড! অভূতপূর্ব, অভাবনীয়!

একদিকে কন্যা হ'য়ে এসেছেন যিনি চিদানন্দময়ী, জগন্মাতা, বিশ্বভুবনেশ্বরী।

অন্যদিকে মা নামের পাগল রামপ্রসাদ। ভক্ত রামপ্রসাদ।

দেবী ও তাঁর ভক্ত এই দুই-এ মিলে চলতে লাগল বেড়ার বাঁধন দেওয়া আর ফিরিয়ে নেওয়া।

চলতে লাগল বেড়ার কাজ।

দিব্য ভাব আর দিব্য অনুভূতিতে রামপ্রসাদের অন্তর ভ'রে উঠলো। বাড়ীঘর দশদিক্ দিব্য ভাব ও আনন্দের পরিপূর্ণতায় প্লাবিত হ'য়ে গেল। আকাশে-বাতাসে আজ তারই স্নিগ্ধ মধুর তরঙ্গ।

রামপ্রসাদ তন্ময়। তিনি মন্ত্রমুগ্ধ।

বেড়ার কাজ চলতে লাগল।

কিন্তু একি সুখ! একি আনন্দ! স্তব্ধ হয়ে গেল বাক্য!

নিঃশব্দে বেড়া বাঁধার কাজ শেষ হ'য়ে গেল।

এবার কন্যা ফিরে চলেছেন।

তাঁকে দেখতে না পেলেও রামপ্রসাদের কৌতূহল হোলো। মর্ম বুঝবার জন্যে তিনি দৌড়ে গেলেন অপর দিকে। দেখতে চান কন্যাকে।

কিন্তু কি দেখলেন।

দেখলেন, মুক্তকেশী এক কন্যা দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। মুখখানি তাঁর দেখা গেল না। শুধু দেখলেন তাঁর মুক্ত কৃষ্ণকেশ-পাশ!

আর দেখলেন, আলতাপরা রাঙা চরণ দুখানি।

এ কে? এ কে?

সারা মনপ্রাণ অন্তরাত্মা ব্যাকুলতর হোলো। কৌতূহল তীব্রতম।

দৌড়ে এলেন বাড়ীর ভিতরে। খুঁজতে লাগলেন নিজের মেয়েকে। ডাকতে লাগলেন চীৎকার ক'রে। আকাশ বিদীর্ণ হবে নাকি!

বাবা পাগলের মতো চীৎকার করছেন কেন! হতবুদ্ধি কন্যা সাড়া দিলেন রান্নাঘর থেকে। এলেন তাঁর কাছে।

রামপ্রসাদ পরম বিস্মিত হলেন।—

একি! মেয়ে যে এতক্ষণ ছিল ঘরের কাজে একান্ত ব্যস্ত!

সে তো বেড়ার বাঁধন ফিরিয়ে দিতে যায় নি!

দেখি, দেখি মা তোর পা দুখানি!

না, পায়ে তো আলতা নেই।

মাথার চুল?

না, চুলও তো এলো নয়।

তবে? তবে?

এতক্ষণে রামপ্রসাদ বুঝতে পারলেন!

বুঝলেন, এ সবই মায়ের চাতুরী। তাঁর ছলনা!

রামপ্রসাদ কেঁদে ফেললেন।

মা, মাগো, সারাটি জীবন কেঁদে কেঁদেই কাটালাম। কত ডাকলাম তোকে! একটি বারও তো দেখা দিসনি মা!

আজ আমার এক অসতর্ক মুহূর্তে চুপি চুপি এলি! আমাকে বুঝতে দিলিনে, অথচ আমারই ঘরে আমার সঙ্গেই কাজ ক'রে গেলি! আর কাজ শেষ ক'রে আমাকে দেখাটি না দিয়ে পালিয়ে গেলি!

মা, মাগো, অন্তরময়ী মা আমার, তুই তো জানিস্, আমি কাজ চাইনে। সিদ্ধি চাইনে। শুধু তোকেই চাই। তোকেই দিবানিশি

ডেকে ডেকে খুঁজে মরি। মা, মাগো, এ তুই কি করলি! আমাকে ভুলিয়ে দেখা না দিয়ে চ'লে গেলি! মা!

মা, মাগো, যদি একান্তই এলি, তবে কেন তুই আমার বেড়া খুলবার কাজে না এসে বেড়া বাঁধবার কাজেই এলি?

মুক্তকেশী মুক্তিদায়িনী মা আমার! তুই আমায় মুক্তি দিবি! সেই মুক্তি না দিয়ে তুই আমার সংসার ঘরের বেড়া বেঁধে গেলি!

মা, মাগো! এ তুই কি করলি! এ তুই কি করলি!

ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন রামপ্রসাদ। সম্বিৎ হারালেন।

বহুক্ষণ কেটে গেল। ধীরে ধীরে ফিরে এলো সম্বিৎ। রামপ্রসাদ প্রকৃতিস্থ হলেন।

দেবী কৃপা করলেন। তাঁর ভুল ভেঙ্গে দিলেন।

রামপ্রসাদ বুঝতে পারলেন, জগৎজননী জগদীশ্বরী কখনও মাতৃরূপে এই ভবসংসারে বেড়া বেঁধে তাঁরই স্নেহময় প্রেমময় শান্তিময় রাজ্যে আমাদের নিরাপদে আশ্রয় দেন; আবার কখনও বা মুক্তিদায়িনী মা হ'য়ে আমাদের সবই মুক্ত ক'রে তাঁরই আনন্দনিকেতনে নিয়ে যান।

তিনি গান বাঁধলেন –

* * *

সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া
তার কাছে তো যম ঘেঁষে না।—

না, ভুল বুঝবার অবকাশ নেই। দুঃখের কারণ নেই। এ সবই লীলাময়ীর লীলা। সর্বক্ষণ আমরা এই লীলাতরঙ্গে ভাসছি।

এই ঘটনাকে উপলক্ষ ক'রে তিনি আরও একটি গান দেশবাসীকে উপহার দিয়ে গেয়েছেন। সেটিও অপূর্ব।

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া?
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি,
বাঁধ দিয়ে ভক্তি-দড়া।

নয়ন থাকতে দেখলে না মন
কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে তনয়ারূপেতে
বেঁধে গেলেন ঘরের বেড়া।

মা, মা, মা!

এত ডাকাডাকি! এত কান্না!

মায়ের দর্শন মিলল না।

কান্নার বেগ বিপুলতর হোলো। ডাকাডাকি বিরামহীন।

দেখি, মা তাঁর সন্তানকে দেখা না দিয়ে কতদিন রইতে পারেন।

মা, মা, মা!

উপেক্ষা করতে আর পারলেন না মা।

তিনি একদিন এলেন। দেখা দিলেন তাঁর সন্তানকে।

সেদিন অমাবস্যা।

তখন মধ্যরাত্রি। চারিদিকে ঘন অন্ধকার।

দেবীপূজা সেদিনকার মতো সমাপ্ত হয়েছে।

রামপ্রসাদ পঞ্চবটীতলায় সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট আছেন। ব্যাকুল কণ্ঠে তখনও তাঁর মা, মা, মা।

হঠাৎ অমাবস্যার কৃষ্ণা রজনী উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। দশদিক আলোয় আলোময়।

একসঙ্গে সহস্র পূর্ণচন্দ্রের উদয় হোলো যেন!

রামপ্রসাদ চোখ মেললেন। তাকালেন।

দেখলেন সেই আলোর কেন্দ্রে জ্যোতির্ময়ী মূর্তি ধ'রে আবির্ভূতা হয়েছেন তাঁরই মা, জগদীশ্বরী। এতকাল যাঁর পূজা ক'রে আসছেন, আজও যাঁর পূজা করেছেন সেই মা, জগৎজননী কালী।

রামপ্রসাদ দেখতে লাগলেন। প্রাণভ'রে দেখতে লাগলেন। চোখের পলক পড়ে না।

শুধু দুই চোখ দিয়ে অঝোরে জল গড়াতে লাগল।

ইচ্ছা হোলো, মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেন। জবা ফুল। মায়ের প্রিয় রাঙা জবাফুল।

রাঙাপায়ে রাঙা জবা।

কিন্তু উপায় কি!

পুষ্পপাত্রে একটি ফুলও আর অবশিষ্ট নেই। সবই এর আগে মায়ের পূজা অনুষ্ঠানে নিবেদন কবা হয়েছে।

উপায় কি!

তাইত!

মা কৃপা ক'বে দেখা দিলেন, আব আমি এমনই হতভাগ্য যে দুটো জবাফুলও মায়ের রাতুল চরণে অঞ্জলি দিতে পারবো না!

হায়!

রামপ্রসাদ ফুলের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

পঞ্চবটীর কাছেই ছিল একটা বড় গাব গাছ।

সেই গাব গাছের তলা দিয়েই রামপ্রসাদ চলেছেন।

কিন্তু একি অলৌকিক কাণ্ড!

গাব গাছের একটি শাখায় তাঁরই হাতের নাগালেব ভিতবে এইতো রয়েছে পূর্ণ বিকশিত দুটি রক্তজবা! কি সুন্দব!

বুঝলেন সবই।

রামপ্রসাদ মুহূর্ত বিলম্ব না ক'রে চয়ণ ক'বে আনলেন সেই দুটি রক্তজবা। গাব গাছে ফোটা জবাফুল।

মা। এনেছি ফুল। ফুল এনেছি।

তোমারই দেওয়া দুটি ফুল তোমার দুই পায়ে অঞ্জলি নিবেদন করছে রামপ্রসাদ। তুমি গ্রহণ কর মা। গ্রহণ কর।

দুই পদতল থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রামপ্রসাদ তাকালেন মায়ের মুখের দিকে।

মা হাসছেন।

রামপ্রসাদ লুটিয়ে পড়লেন মায়ের পদতলে।

মা, মা, মা!

আর একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল রামপ্রসাদকে কেন্দ্র ক'রে।—

রামপ্রসাদ গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে যাবেন। স্নান সেরে মায়ের ভোগ নিবেদন করবেন।

দুপুর গড়িয়ে যায়। খানিকটা ত্রস্তপদেই তাই বাড়ী থেকে বের হচ্ছেন।

এমন সময়ে গৃহে এক অপরিচিতা নারীর আবির্ভাব হোলো। তিনি এসে দাঁড়ালেন তাঁরই অঙ্গনে।

সুন্দর কান্তি। সুঠাম দেহ। তাঁর অঙ্গলাবণ্যে দশদিক্ উদ্ভাসিত!

মৃদুকণ্ঠে তিনি বললেন, বাবা, গান শুনতে এলাম। তোমার কণ্ঠের মাতৃসঙ্গীত যেন সুধামাখা। বড় সাধ হয়েছে। আমায় গান শোনাও।

দিব্য ভাবে চারিদিক যেন ভ'রে গিয়েছে। দিব্য অনুভূতিতে রামপ্রসাদের অন্তর যেন উথলে উঠেছে।

তিনি কেমন যেন হ'য়ে পড়লেন। খোঁজ করতেও ভুলে গেলেন, কে এই অপরিচিতা, কোথা থেকে আসছেন; বসবার আসন দিতেও তিনি ভুলে গেলেন।

আনমনে বললেন, একটু অপেক্ষা কর মা। আমি গঙ্গাস্নান ক'রে আসি। মায়ের ভোগ আরতি হোক। তারপর তোমাকে গান শোনাব। যত গান শুনতে ইচ্ছা হয় তত গানই তোমাকে শোনাব। তুমি একটু অপেক্ষা কর।

রামপ্রসাদ গঙ্গাস্নান করে ফিরে এলেন। ফিরে এলেন একটু চিন্তিত ভাবেই। কে ইনি? এঁকে তো পূর্বে কখনও দেখিনি! কি দিব্য কান্তি! কি দিব্য ভাব! কি অপূর্ব সুধামাখা কণ্ঠস্বর! আহা!

বাড়ী এসে দেখেন সেই অপরিচিতা নারী নেই। ব্যাকুলভাবে অন্বেষণ করলেন এদিক-ওদিক। কোথাও তাঁর সন্ধান পেলেন না।

রামপ্রসাদ খুবই বিষণ্ণ হ'য়ে পড়লেন। এক অপরিচিতা নারী উপযাচিকা হ'য়ে তাঁর কাছে গান শুনতে চাইলেন। মায়ের গান। তাঁকে শোনানো হোলো না!

বিষণ্ণ অন্তর নিয়ে রামপ্রসাদ পূজা মন্দিরে গেলেন।

যথারীতি ভোগ আরতি হোলো।

এইবার বসলেন ধ্যানে।

একি! ধ্যানে যে সেই অপরিচিতা নারী-মূর্তিই আবির্ভূতা হলেন! মুখে মৃদু মধুর হাসি! মরি মরি!

তাঁর রূপের প্রভায় দশদিক ঝলমল!

রামপ্রসাদ দেখতেই লাগলেন। চিনতে পারলেন সেই দিব্য মূর্তিকে। মা অন্নপূর্ণা ইনি।

রামপ্রসাদ লুটিয়ে পড়লেন—

মা, মা, মা!

মা কথা কইলেন, কণ্ঠে অনুযোগের সুর।

বাবা রামপ্রসাদ, তোমার গান তোমারই মুখে শুনব ব'লে কাশী থেকে এলাম। কিন্তু আমাকে তো তোমার সুধামাখা গান শোনালে না, বাবা।

একি রঙ্গ রঙ্গময়ীর!

রামপ্রসাদ উদ্বেল হ'য়ে উঠলেন।

শোনাব, মা, শোনাব। প্রাণ ভ'রে দিবানিশি তোমায় আমার গান শোনাব।

প'ড়ে রইল সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম, বিষয়-আশয়। প'ড়ে রইল স্ত্রী, পুত্র-কন্যা। প'ড়ে রইল ভবিষ্যতের ভাবনা।

তখনই ছুটলেন কাশী।

মা স্বয়ং তার গান শুনতে চেয়েছেন!

এক মুহূর্তও দেরী সয় না। ছুটেই চলেছেন।

কী দুর্লভ সৌভাগ্য!

ছুটেই এলেন ত্রিবেণী।

বড় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন রামপ্রসাদ। গঙ্গার ঘাটে বিশ্রাম করতে বসলেন।

শরীর এলিয়ে পড়ল। শুয়ে পড়লেন।

খানিক বাদে তন্দ্রা এলো।

হঠাৎ দশদিক উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। সেই ঔজ্জ্বল্যের কেন্দ্রস্থলে ধীরে ধীরে আবির্ভূতা হলেন মা অন্নপূর্ণা সেই অপরিচিতা নারীরূপটি ধ'রে।

বীণা-নিন্দিত কণ্ঠে মা অন্নপূর্ণা বললেন,—

বাবা রামপ্রসাদ, আমাকে গান শোনাতে তোমার কাশী যেতে হবে কেন? আমি শুধু কাশীতেই থাকি? আর কোথাও নয়? সারা ত্রিভুবনই যে আমার বিহার ক্ষেত্র। বিশেষ ক'রে ভক্তের হৃদয়-মন্দিরে যে আমার নিত্য অধিষ্ঠান। তুমি আমার পরম ভক্ত। তোমার হৃদয়েই তো আমি সারাটিক্ষণ রয়েছি। কাজ কি তোমার দৌড়ঝাঁপে? পবিত্র এই গঙ্গার ঘাটে ব'সেই প্রাণ ভ'রে আমায় গান শোনাও বাপ। আমি শুনি।

রামপ্রসাদ কি বলবেন! আনন্দে আত্মহারা তিনি! কৃতকৃতার্থ তিনি! হৃদয়ের আকুল আবেগে একটির পর একটি ক'রে বহু গান তিনি গাইলেন।

এ এক অপূর্ব সংযোগ! এমনটি আর কোথাও কেউ শুনেছে?

গাইছেন ভক্ত রামপ্রসাদ। শুনছেন মা অন্নপূর্ণা. নিজে উপযাচিকা হ'য়ে।

কত গানই না গাইলেন সেখানে সেদিন রামপ্রসাদ! তুলনা কোথাও মিলবে না তার।

সেদিনকার গাওয়া একটি গান সকল মাতৃভক্ত সাধকের অন্তরের কথা। শাশ্বত সত্যবাণী।

আর কাজ কি আমার কাশী?
মায়ের পদতলে প'ড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
হৃদ্‌কমলে ধ্যানকালে আনন্দ সাগরে ভাসি;
ওরে কালীপদ কোকনদে তীর্থ রাশি রাশি॥

রামপ্রসাদের আর কাশী যাওয়া হোলো না।

প্রয়োজন নেই।

ফিরে এলেন কুমারহট্টে।

রামপ্রসাদ নিত্য নূতন নূতন গান রচনা করেন। প্রাণের আবেগে সেই সব গান গেয়ে জননীর উদ্দেশ্যে নিত্য অঞ্জলি দিয়ে চলেন।

হালিশহর চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত কাঁচরাপাড়ার অতি নিকটে অবস্থিত একটি রেল স্টেশন।

বহুলোক এখনও হালিশহরে রামপ্রসাদের সাধনপীঠ ও পঞ্চবটীতলা দেখতে যান।

এখানে বর্তমানে একটি সুন্দর মন্দির নির্মিত হয়েছে।

--:০:--

শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর

দক্ষিণ ভারত। কৃষ্ণবেন্বা নদী।·····

সেই নদীব কূলে এক গাঁয়ে বিল্বমঙ্গলের বাস।

নদীর ওপারে চিন্তাম'ণর বাসা।

তিনি কুলটা।

বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিতে আসক্ত।

সেদিন বিল্বমঙ্গলেব পিতৃশ্রাদ্ধেব তিথি।

আগেব দিন চিন্তামণি ব'লে দিয়েছেন, কাল আর এপাবে এসো না।

সকাল থেকে'ই দুর্যোগ চলছে। দারুণ বৃষ্টি। ঝড়ঝঞ্ঝা। বাজ পড়ছে মুহুমু্হু।

বিকাল হ'তে না হ ভেই বিল্বমঙ্গলের ওপারে যাবাব প্রবল বাসনা হোলো। পিতৃশ্রাদ্ধ সারলেন কোনও বকমে।

কিন্তু যাবেন কি ক'বে? নদীতে নৌকা নেই একখানাও।

চীৎকাব ক'বে মাঝিদের ডাকলেন—যদি পাশে কোথাও নৌকা থাকে। মাঝিদেব সাড়া মিললো না।

বিল্বমঙ্গলেব যেতেই হবে ওপারে।

কিন্তু উপায় কি!

বিলম্বও সইছে না।

বিল্বমঙ্গল জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সাঁতার দিয়ে নদী পাব হবেন। ঝড় জলের নদীতে তোড় বেশী। তিনি ডুবে যান আর কি!

দিশাহাবা তিনি। তিনি যেন উন্মাদ।

হঠাৎ সামনে কি একটা ভেসে আসছে দেখতে পেলেন।

মনে করলেন, বুঝিবা একখানা কাঠ। কিন্তু কাঠ নয়। আসলে মানুষের একটা গলিত শব।

সেই শব ভর ক'বে কোনও মতে ওপারে ডাঙ্গায় গিয়ে উঠলেন।

ওপারে গিয়ে আর এক জ্বালা।

দারুণ ঝড়বৃষ্টি। বাতাসের শোঁ শোঁ।

বারবার ডাকাডাকিতেও চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলের ডাক শুনতে পেলেন না। তিনি ছিলেন ঘুমিয়ে।

দেয়ালেব গর্তের ভিতর মুখ দিয়ে লম্বা একটা সাপ ঝুলছিল। বিল্বমঙ্গল মনে কবলেন, বুঝিবা লম্বা দড়িই হবে।

তিনি ওই সাপকে অবলম্বন ক'বে দেয়ালের উপব উঠলেন। তারপর লাফ দিয়ে পড়লেন ওদিকে।

বিল্বমঙ্গল যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলেন ওঃ— !

পতনের শব্দে আর আর্তনাদে জেগে উঠলেন চিন্তামণি। আলো হাতে এগিয়ে আসলেন। দেখতে পেলেন বিল্বমঙ্গলকে।

কিন্তু কাছে যায় সাধ্য কার? দারুণ দুর্গন্ধ।

ব্যাপাব কি!

শুনলেন সব কথা। কি ক'রে আসলেন সেই সব বৃত্তান্ত।

দেখতে পেলেন, দড়ি নয়—সাপ। কাঠ নয়—গলিত শব।

এবাব চিন্তামণি তাঁকে খুবই তিরস্কার করলেন। যৎপরোনাস্তি। ছি ছি ছি।

—তুমি আমাকে দেখবাব জন্যে এতই পাগল যে মড়া চিনতে পারলে না! সাপ বুঝতে পারলে না! হাড়গোড় ভাঙ্গতে পাবে, মারা যেতে পার, তাও বুঝলে না! অত উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়লে!

দেখ, আমি কুলটা। আর, তুমি ব্রাহ্মণ। আমার উপর তোমাব যা টান, তাব শ'ভাগের ভাগও যদি তুমি শ্রীকৃষ্ণে ফেলতে, তোমাব জন্ম সার্থক হোতো। তুমি উদ্ধার পেতে।

শুভক্ষণ ব'লে একটা কথা আছে।

কী শুভক্ষণেই চিন্তামণি এই কথাগুলো বললেন!

কী শুভক্ষণেই না বিল্বমঙ্গল এই সব শুনলেন!

শুধু শুনলেন না। 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল।'

বিল্বমঙ্গল ব'লে উঠলেন—

ঠিক ঠিক ঠিক!

তিনি তক্ষুনি ঘর ছাড়লেন। চিন্তামণিকে ছাড়লেন। বেরিয়ে পড়লেন মুক্তপথে।

হা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!

পথে দেখা হ'ল সাধক সোমগিরির সঙ্গে। তাঁর কাছে কৃষ্ণমন্ত্র নিলেন।

আবার ছুটলেন।

হা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!

চলেছেন বিল্বমঙ্গল চলেছেন।

হা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!

একদিন এক পুকুরঘাটে এসে বসেছেন।

সেখানে বহু রমণী এসেছেন স্নান করতে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন এক বণিকের স্ত্রী। অসামান্যা রূপসী!

তাকে দেখে বিল্বমঙ্গলের মন টললো।

স্নান ক'রে বণিকবধূ ঘরপানে চললেন। বিল্বমঙ্গল পিছু নিলেন। বধূ চ'লে গেলেন নিজের ঘরে। বিল্বমঙ্গল ব'সে রইলেন দুয়ারে।

এমন সময়ে তাঁর স্বামী এলেন। দেখলেন দুয়ারে এক সাধু।

বহু ভাগ্য আমার। আপনার দর্শন মিলেছে। আপনি আমার অতিথি হবেন।

আপনার ঘরণীকে এনে একবার আমায় দেখাতে পারেন, শ্রেষ্ঠি?

বণিক সম্মত হলেন। নিয়ে এলেন স্ত্রীকে দামী কাপড় পরিয়ে। নানা আভরণে সাজিয়ে।

নিমেষে বিল্বমঙ্গলের চেতনা ফিরে এলো।

আবার ভুল! হা কৃষ্ণ!

নিজের মনেই ব'লে চললেন—

ওরে, ওরে আমার পোড়া চোখ দুটো! আবার মোহ! আবার রমণীর রূপতৃষ্ণা!

দুটো সূচ আনবে, মা?

বধূ নিয়ে এলেন।

মা, এই সূচ দুটো আমার দুই চোখে বিঁধিয়ে দাও তো!

বধূ অবাক! সাধু বলছেন কি!

সাধুর ওই একই কথা! বারবার একই অনুরোধ!

সাধুর আদেশ অমান্য করতে নেই। সাধু অসন্তুষ্ট হ'লে অকল্যাণ হবে। বধূ স্বামীর আজ্ঞা নিয়ে সূচ দিয়ে বিল্বমঙ্গলের দুই চোখ বিঁধিয়ে দিলেন।

অন্ধ বিল্বমঙ্গল আবার চললেন।

দুই চোখ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। নয়নজলও অবাধ।

হা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!

দিন যায়।

কৃষ্ণ অনুরাগ তাঁর বেড়েই চলে।

ঘুরতে ঘুরতে বিল্বমঙ্গল একদিন বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হলেন।

অনুরাগ চক্ষু তাঁর জ্বল জ্বল করছে। বাইরের চোখ অন্ধ হলেও বা কি হবে?

বিল্বমঙ্গল ক্ষণেক হাসেন। ক্ষণেক কাঁদেন। দিবানিশি শুধু কৃষ্ণবিলাপ, কৃষ্ণকীর্তন।*

'হে দেবতা, হে আমার দয়িত, হে নিখিল ভুবনের একমাত্র বন্ধু, হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণা-সাগর, হে নাথ, হে রমণ, ওগো আমার নয়নানন্দ নন্দন, তুমি কতদিনে আমায় দেখা দেবে?'

অশ্রুজলে সর্বাঙ্গ সিঞ্চিত হয়। তিনি আর্তনাদ করেন—

'হে মাধব, হে বলরাম-অনুজ, হে ত্রিভুবনের গুরু, হে কমললোচন, হে গোপীজননাথ আমাকে তুমি পালন কর, পালন কর। আমি একমাত্র তোমাকেই জানি। অপর কাউকেই জানিনে আমি।'

---

*এই কৃষ্ণবিলাপই কালে বিখ্যাত গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত নামে পরিচিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর বা লীলাশুক বিরচিত একখানি অপূর্ব গ্রন্থ।

সন্ধ্যা-আহ্নিক করা ছেড়ে দিয়েছেন বিল্বমঙ্গল। স্নান করা তা-ও আর হ'য়ে ওঠে না। ব্রাহ্মণের পক্ষে অবশ্য করণীয় যে নিত্য তর্পণ করা, তা-ও বন্ধ। কোথায় কখন থাকেন তার ঠিক ঠিকানা নেই। শুধু আর্তি, শুধু বিলাপ আর শরণাগতি, শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি।—

'হে সন্ধ্যাবন্দন তোমার কল্যাণ হোক। হে স্নান, তোমাকে নমস্কার করি। হে দেবগণ, হে আমার পিতৃ-পিতামহগণ, তোমরা তর্পণ-কাজে অক্ষম আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি যত্রতত্র অবস্থান ক'রে যাদবকুলের অলঙ্কার কংসারি শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার স্মরণ করবো। আর এতেই আমার সকল পাপের ক্ষয় হবে। আমি বিশ্বাস করি, এই-ই আমার পক্ষে যথেষ্ট। কি প্রয়োজন আমার আজ সন্ধ্যাবন্দনার, স্নানের, তর্পণের ?'

কখনও-বা তাঁর কণ্ঠে একান্ত অনুনয়ের সুর বেজে ওঠে—

'বংশী-নিনাদের অনুচর যে মধুব কটাক্ষ সেই কটাক্ষ পাতে আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ওগো, তুমি প্রসন্ন হও। তুমি প্রসন্ন হ'লে জগতের অন্য কোনও বিষয়ে আমার প্রয়োজন হবে না। তুমি অপ্রসন্ন হ'লে আমার প্রয়োজন থাকবে না আর কোনও পদার্থে।'

দিবানিশি অষ্টপ্রহরই এই ধরনের আকুতি, বিলাপ!

একদিন বিল্বমঙ্গল বৃন্দাবনে ব্রহ্মকুণ্ডের পাশে ব'সে আছেন। এমন সময়ে কৃষ্ণ গোপবালকের বেশে কাছে এলেন।

রোদে ব'সে ভাবছ কি ? উপোসী রয়েছ কেন ? ছায়ায় এসে বোসো। তোমার জন্যে খাবার এনেছি।

আমি অন্ধ। দেখতে পাইনে। তুমি কে ?

আমি এক গোপের ছেলে। মা এই খাবার দিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। খাবে চল।

গায়ে অপূর্ব পদ্মগন্ধ। কণ্ঠে মুরলীর মধুর ধ্বনি।

বিল্বমঙ্গল বুঝলেন, এ বালক যে-সে বালক নয়। এ সে-ই যাঁর

জন্যে তিনি পথে বেরিয়েছেন। তাঁর প্রাণরমণ। হৃদয়বিহারী হৃদয়সর্বস্ব। সব সুখদুঃখমন্থনধন।

বিল্বমঙ্গলের ইচ্ছা হ'ল, কাছে পেলে বালককে সাপটিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

আমি অন্ধ। দেখতে পাইনে। তুমি আমার হাত ধ'রে ছায়ায় নিয়ে চল। সেখানে গিয়ে খাব।

বালক রসিক চূড়ামণি। দূর থেকে হাত বাড়িয়ে আঙ্গুল দিয়ে হাতছানি দেয়। আব মুচকি মুচকি হাসে।

তুমি কোথায়? তোমার হাত যে আমি মালুম করতে পারছিনে। ধরবো কেমন ক'বে?

এই তো। ধর না।

বালক হাসতে লাগল।

বিল্বমঙ্গল এদিক-ওদিক হাত বাড়ালেন।

হাসতেই লাগল বালক।

কোথায় তুমি? কোথায় তোমার হাত?

বালক দূর থেকে হাত দেখায় আর হাসে।

হঠাৎ বিল্বমঙ্গল দৌড়ে গিয়ে বালককে সাপটিয়ে জড়িয়ে ধরলেন।

পুলকে দুই চোখ বেয়ে অশ্রু ফোয়ারাব মতো ছুটলো।

'দীন দরিদ্র যেন পাওল পরশমাণিক।'

'বহুকালের ক্ষুধার্ত যেন পাইল অমৃত কলস।'

আহা! আহা!

হাত ছাড়। হাত ছাড়। এত জোরে আমার হাত ধরেছ কেন? লাগে যে!

ওরে! এ হাত কি ছাড়তে পারি? তোমায় আজ আমি জোরে হৃদয়ের মধ্যে বেঁধে রেখে দেবো। অনেক দুঃখে, বহু সাধ্যসাধনা ক'রে যদি বা এমন ধন পেলাম, তা কি ছাড়তে পারি?

তোমার মতো এমন লোক তো কখনও দেখিনি।

বালক হাত টানাটানি করতে লাগল। সে বিল্বমঙ্গলের অনুরোধ কি শোনে !

সে যত হাত ছাড়, হাত ছাড় বলে, বিল্বমঙ্গল তত আরও শক্ত ক'রে তার হাত ধরেন।

হঠাৎ বালক চেঁচিয়ে উঠলো—লাগে লাগে। মরে গেলুম।

বালক সত্যিই ব্যথা পাচ্ছে, এই মনে ক'রে হাত আলগা দিলেন বিল্বমঙ্গল।

অমনি বালক হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে স'রে গেল। হাসতে লাগল ফিকফিক ক'রে।

এবার গর্জন ক'রে উঠলেন বিল্বমঙ্গল।

আমি অন্ধ। দেখতে পাইনে। তুমি ছল ক'রে হাত ছিনিয়ে নিলে। এতে তোমার কণামাত্র পৌরুষ নেই। যদি আমার হৃদয় হ'তে চলে যেতে পার, তবেই বুঝি তোমার পৌরুষ !

কৃষ্ণের অন্তরে চরম আনন্দ। বাইরে পরম কৌতুক।

এসো আমার সঙ্গে। ধীরে ধীরে এসো।

কৃষ্ণ আগে আগে। বিল্বমঙ্গল পিছু পিছু।

বিল্বমঙ্গল দেখতে পান না। অন্ধ।

চুম্বকের সাথে সাথে যেমন লোহা চলে, ঠিক তেমনি কৃষ্ণের সাথে সাথে চলেছেন বিল্বমঙ্গল।

'তুমি এই গাছতলায় বসো। দুধ খাও।

না আমি খাব না। যদি তোমার নয়নাভিরাম রূপটি আমায় দেখাও, তবেই আমি খাব। নইলে উপোস ক'রে মরবো।

কি দেখবে ? আর দেখে হবেই বা কি ? 'গোপশিশু দেখনি কখনও ?'

তুমি বলছো কি ? না বুঝে সুঝে প্রলাপ বকছো ? জান না, আমার কাজ সব সময়েই গোপের সঙ্গে ? গোপ নিয়েই আমার দিবানিশি কারবার ?

বিল্বমঙ্গলের চোখে জল, মুখে হাসি।

তিনি কৃষ্ণকে ধরতে গেলেন। কৃষ্ণ পিছু স'রে গেলেন।

বিল্বমঙ্গল আবার ধরতে গেলেন। কৃষ্ণ আবার পিছু সরলেন।

আবার। আবার।

বিল্বমঙ্গলের চোখ নেই। সামনে তাঁর চিরবাঞ্ছিত ধন।

ওগো কৃষ্ণ! তুমি বড়ই নির্দয়, নিঠুর। তোমার তিলমাত্র দয়া নেই! তোমাকে দেখে যদি আমার প্রাণ রক্ষা পায়, তবে তা দেখাবে না! আর, তাতে তোমার ক্ষতিটাই বা কি!

কৃষ্ণ ফিক ক'রে হেসে উঠলেন।

কেন, হাস? হাসবার কি হয়েছে?······আমি কি উপায় করি! বল না, বল না একটিবার।······দেখ আমি তোমার নিন্দা করেছি ব'লে তুমি কি আমার উপর রাগ করলে?

আমি কালো। কালো রূপের কি দেখবে, বল? আর, এই কালো রূপ দেখে কি সুখই বা পাবে? তার চাইতে বরং সুখ চাও। চাও ঐশ্বর্য—ধন-দৌলত বিষয়-আশয়। আমি তোমায় সব দেবো। সব দেবো।

তুমি আমায় ভোলাতে চাও? ভোলাতে চাও প্রলোভন দেখিয়ে? ঐশ্বর্যের প্রলোভন?

কৃষ্ণ হাসলেন।

যদি কৃপা করলেই, তবে আমার চোখ ফিরিয়ে দাও। আর, আমার সামনে ত্রিভঙ্গ হ'য়ে মুখে বাঁশীটি দিয়ে একটিবার দাঁড়াও। 'আমি নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।'

কৃষ্ণ নিজের হাতে বিল্বমঙ্গলের দুই চোখ বুলিয়ে দিলেন।

নিমেষে বিল্বমঙ্গল দৃষ্টি ফিরে পেলেন।

তিনি দেখলেন—সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মনোমোহন বংশীবদন। তাঁর প্রাণনাথ। প্রাণরমণ।

মরি মরি! কী রূপ! কী রূপ!

—'প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের বপুখানি মধুর, 'মধুর হৈতে সুমধুর'। তাঁর বদনখানি মধুর, মধুর চেয়েও মধুর। শ্রীঅঙ্গে তাঁর মধুর সৌরভ, মুখে তাঁর মধুর হাসি। শুধু মধুব নয়, 'মধুর হৈতে সুমধুর', তাহা হৈতে সুমধুর।'

মরি মরি! মরি মরি!

'কোটি নেত্র নাহি দিলে সবে দিলে দুই—
তাহাতে নিমেষ – কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি।'

বিল্বমঙ্গল বৃন্দাবনে বাস করতে লাগলেন।

কৃষ্ণ রোজ এসে তাঁকে দুধ আর নানারকম খাবার খাইয়ে যান।

হঠাৎ একদিন সব ধন আর ঐশ্বর্য বিলিয়ে দিয়ে বিল্বমঙ্গলের খোঁজ করতে করতে চিন্তামণি বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হলেন। একদিন দেখা পেলেন তাঁর। লুটিয়ে পড়লেন দুই পায়ে।

বিল্বমঙ্গল তাঁকে গুরুভাবে প্রণাম করলেন।

—গুরু চিন্তামণিব জয় হোক!

কৃষ্ণের দেওয়া নানা খাবার খেতে দিলেন চিন্তামণিকে।

আমি অন্নের কাঙাল হ'য়ে তোমার কাছে খেতে আসিনি, ঠাকুর। আমি তোমার শরণ নিলাম। তুমি আমায় আশ্রয় দাও।

কৃষ্ণের কৃপায় বিল্বমঙ্গলের কাছে জগৎ আজ মধুময়। মধুময় চিন্তামণির আচার আচরণ. কথাবার্তা। তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। তিনি নীরবে মধু আস্বাদন করতে লাগলেন।

চিন্তামণি ব'লে চললেন—

তুমি যেমন দেখেছ তোমার হৃদয়-বিহারীকে, তেমনই দেখাও আমায় সেই মুরলী-বদন, শ্যামল-কিশোর।

বারবার একই কথা। অনুরোধ। বিলাপ। আর্তনাদ।

বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির কৃষ্ণপ্রেম দেখে পুলকিত হলেন।

কৃষ্ণ অবশ্যই তোমায় কৃপা করবেন। তিনি কৃপাময়। প্রেমময় তিনি। তিনি অন্তরবিহারী। অন্তরেই তাঁকে অন্বেষণ কর, চিন্তামণি। অন্তরেই তাঁকে পাবে।

চিন্তামণি নয়ন মুদিত করলেন।

তিনি দেখলেন, তাঁরই সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন বৃন্দাবনচন্দ্র। মুরলীবদন নটবর শ্যামসুন্দর।

মুখে তাঁর মৃদুমধুর হাসি।

কোকিল ডেকে উঠলো। ময়ূর নাচতে লাগল। বৃক্ষশাখা হ'তে কুসুম ঝ'রে পড়তে লাগল চিন্তামণির মাথায়, সর্বগাত্রে।

কৃষ্ণচন্দ্র তখনও হাসছেন।

সুপ্রসন্ন সেই মধুর হাস্যে উদ্ভাসিত তাঁর বদনকমল। সে হাসির আলোয় ভ'রে গেল দশদিক। প্লবিত করল সবাকার প্রাণ। সেই হাসির একটি রশ্মিরেখা বৈরাগ্য-স্নাত চিন্তামণির ললাট স্পর্শ করল।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১৫১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময়ে শ্রীবিল্বমঙ্গল বিরচিত শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হ'যে পড়েন। তিনি এই গ্রন্থখানির প্রথম অধ্যায়ের ১১২ শ্লোক লিখিয়ে পুরীতে আনেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তবৃন্দ তাঁর আনা এই পুঁথিখানি নকল ক'রে রাখেন। বৃন্দাবনধামে শ্রীগোপাল ভট্ট, চৈতন্য দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের টীকা রচনা করেন। যদুনন্দন দাস এই গ্রন্থখানির পদ্যানুবাদ করেন।

শ্রীবিল্বমঙ্গল শুধু রাগমার্গেই শ্রীভগবানের ভজন করেন নি। তিনি শ্রীকৃষ্ণের রূপ-সুধা দুই নেত্র ভ'রে পান করেছেন আর অপূর্ব কবিত্বপূর্ণ ভাষায় তা প্রকাশ করেছেন।

নীলাচলে অবস্থান কালে শ্রীমহাপ্রভু তাঁর দুজন অন্তরঙ্গ রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে দিবানিশি

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ।'

আস্বাদন করতেন। মহাপ্রভু বলতেন শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতে কোথাও রসাভাস বা সিদ্ধান্ত বিরোধ নেই।

অর্ধকালী

ময়মনসিংহ জেলায় আলাপসিংহ পরগণা। সেখানে পণ্ডিত-বাড়ী গ্রাম।

সেই গ্রামে এক সময়ে দ্বিজদেব নামে একজন নিষ্ঠাবান পণ্ডিত বাস করতেন।

তাঁর ছিল এক চতুষ্পাঠী। সেখানে বহু ছাত্র অধ্যয়ন করতেন।

দ্বিজদেব অধ্যাপনা করেন আর পূজা অর্চনা করেন শিশুর মতো সরল ছিলেন তিনি।

তাঁর ঘরে জগৎজননী তাঁরই কন্যারূপে জন্ম নিলেন

দ্বিজদেবের চতুষ্পাঠীতে নানা জায়গার পড়ুয়াদের ভীড়।

তাদের মধ্যে রাঘবানন্দ একজন।

সরল ব্রাহ্মণ' বিশ্বাসের ভরা নৌকায় পাল তুলে তিনি চলেন অবিশ্বাস কাকে বলে সন্দেহ কি বস্তু তা তিনি জানেন না।

গাঁয়ের লোকেরা সকলেই রাঘবানন্দকে ভালবাসেন। তাঁর মা নেই, বাবা নেই। রাঘবের নিতান্ত শিশুকালেই তাঁরা গত হয়েছেন।

বালক রাঘব দ্বিজদেবের আশ্রয়ে এলেন। সেখানেই পড়াশুনা করতে লাগলেন।

পড়ুয়াদের কাছে রাঘব বোকা। নিতান্ত বোকা দুগ্ধ-শুভ্র সরল মানুষকে লোকে বোকা ভিন্ন আর কি বলে?

একদিন পড়ুয়ারা বললেন, চল মাছ ধরতে যাই।

নতুন জল। মাঠের নালা বেয়ে অগুনতি মাছ উজান পথে ছুটছে।

সকলে মাছ ধরতে এলেন

নালায় বাঁধ দিতে হবে। বাঁধ না দিলে মাছ আটকান যাবে না।

কিন্তু দীর্ঘ বাঁধ বাঁধবার মাটি কোথায়? সঙ্গে কোদালি নেই। কোদালির অভাবে বাঁধ বাঁধতে সময়ও তো লাগবে যথেষ্ট। এর মধ্যেই মাছ উধাও হবে।

সকলে রাঘবকে বললেন, রাঘব, তুই এখানে শুয়ে পড়। শুয়ে পড় বাঁধের মত হয়ে।

রাঘব অমনি সেখানে শুয়ে পড়লেন। তার উপরেই এখানে সেখানে মাটি, পাতা এসব চাপিয়ে বাঁধের কাজ চলল।

প্রচুর মাছ ধরা হ'ল অল্প সময়ের মধ্যেই। মনের উল্লাসে পড়ুয়ারা মাছ নিয়ে বাড়ী চলে এলেন।

কিন্তু আসবার সময়ে তাঁরা রাঘবকে ডেকে আনতে ভুলে গেলেন।

রাঘব শুয়ে ছিলেন, শুয়েই রইলেন। উঠলেন না। কেউ উঠতে তো বলে নি। উঠবেন কেমন করে?

বেশ কিছুক্ষণ পরে রাঘবের খোঁজ পড়ল।

কোথায় রাঘব?

সকলের মনে পড়ল ঘটনা। তাঁরা মাঠে গিয়ে রাঘবকে দেখতে পেলেন।

রাঘব ঠিক তেমনিই শুয়ে রয়েছেন। তেমনিই বাঁধের মতো হয়ে।

সকলে হেসেই খুন! হাসতে হাসতে তারা রাঘবকে উঠিয়ে আনলেন।

এমনিই সরল রাঘব!

দ্বিজদেব মানুষ চিনতেন। তিনি আশীর্বাদ করলেন—

রাঘব, বাড়ী যাও। তোমার পড়া সাঙ্গ হয়েছে। তোমার কল্যাণ হোক। তুমি সুখী হও।

জগন্মাতাও সরলতার প্রতিমূর্তি এই রাঘবের কাছে বাঁধা পড়েছেন।

তাঁরই ইচ্ছায় আর নির্দেশে দ্বিজদেব রাঘবের সঙ্গে নিজ কন্যারূপী জগৎজননীর বিবাহ দিলেন।

মর্ত্যের মানুষের সঙ্গে মানুষরূপী জগন্মাতার বিবাহ হ'ল।

দ্বিজদেবের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে রাঘব নব বধূকে সঙ্গে ক'রে স্বগ্রামে চলেছেন।

সঙ্গে জগন্মাতা! চিদানন্দময়ী! হোন না বধূরূপে।

রাঘবের মন আনন্দে ভরপুর। আনন্দ দুই চোখে। আনন্দ তাঁর সারা মুখে। সর্বাঙ্গেই যেন আনন্দের তুফান বইছে।

সরল ব্রাহ্মণ। গ্রামবাসী যাঁর সঙ্গেই দেখা হয় তাঁকেই বলেন, পড়া সাঙ্গ করে গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে ফিরে এলাম। আর দেখ, আমি বিবাহ করেছি। আমার সঙ্গে যিনি রয়েছেন, তিনিই আমার সহধর্মিণী।

সকলেই মহাসুখী।

বটে? বটে? বেশ। ভালই হ'ল।

পথে শুভাকাঙ্ক্ষী ঘোষ মশাইএর সঙ্গে দেখা।

ঠাকুর মশাই, এত আনন্দ কেন? সঙ্গে ইনি কে?

বহুদিন পরে ঘরে ফিরে এলাম। গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে ফিরে এলো। মা-র কোলে প্রবাসী ছেলে ফিরে এলো অনেক দিনের পর। আনন্দতো হবেই। আর, এঁর কথা? ইনি আমার স্ত্রী, সহধর্মিণী। সম্প্রতি আমি বিবাহ করেছি।

বটে? এ যে বড় আনন্দের কথা। উল্লাসে আমার যে নাচতে ইচ্ছা করছে। আমাদের ঠাকুর এলো ঠাকুরাণীকে সঙ্গে ক'রে। বা! বা!

ঘোষ মশাই রাঘবের গৃহে এলেন। এলেন আরও বহু জন। নারী পুরুষ। বালবৃদ্ধ। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ।

সকলে একত্র হ'য়ে উৎসবের আয়োজন করলেন। বড় ঘটা ক'রে হবে বধূবরণ উৎসব

ঘোষ মশাই ই অগ্রণী। তাঁর ভাণ্ডার তিনি খুলে রেখেছেন। এমনি আরও অনেকে।

পাকস্পর্শ।

বহুলোক নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছেন।

যথা সময়ে সকলেই আহারে বসলেন

পাকস্পর্শে নববধূকে স্বহস্তে অন্ন পরিবেশন করতে হয়।

রাঘব-গৃহিণী অন্ন পরিবেশন করতে শুরু করলেন হোন না কেন তিনি জগন্মাতা। জগদীশ্বরী। নববধূ তো বটে।

নববধূর দুই হাতে অন্নের থালা। অবগুণ্ঠনে মুখখানি ঢাকা তিনি অন্ন পরিবেশন করছেন।

হঠাৎ দমকা বাতাস বইল। উঠিয়ে দিল মাথার ঘোমটা।

নববধূ। লজ্জা রক্ষা করতে হবে। দুখানি হাতই যে আটকা কি করেন?

ত্বরিতে আর দুখানি হাত দিয়ে তিনি ঘোমটা সামলিয়ে নিলেন

অভূতপূর্ব এই ঘটনা—ঘোষ মশাই-এর দৃষ্টি এড়ালো না। আরও অনেক ভাগ্যবানের চোখেও তা পড়ল।

জানাজানি হ'য়ে পড়ল। রাঘবানন্দ-গৃহিণী, এযে মানবীরূপে দেবী।

নিমেষে রাঘবের গৃহ-প্রাঙ্গণ লোকে পূর্ণ হ'য়ে গেল। নিমেষে সে প্রাঙ্গণ তীর্থে পরিণত হ'ল।

জগন্মাতা স্বয়ং অন্ন পরিবেশন করেছেন!

সে অন্ন হাতে নিয়ে কেউ নাচতে লাগলেন। কেউ উল্লাসে কাঁদতে লাগলেন। কেউ ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন।

নিজেদের সীমাহীন সৌভাগ্যের কথা স্মরণ ক'রে সবাই নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন।

সকলেই রাঘবানন্দকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন।

এই রাঘবানন্দ-গৃহিণী হলেন অর্ধকালী।

একাধারে জগন্মাতা কালিকা, আর মানবীরূপে বধূ!

এ এক অভিনব ঘটনা।

এমনটি কেউ আর আগে দেখে নি। আর কেউ আগে শোনেও নি।

এই বংশের সন্তান মিত্তড়ার গুরু ঠাকুরদের বংশ হলেন অর্ধকালী বংশ।

এঁদের বহু শিষ্য আজও দুই বঙ্গে ছড়িয়ে আছে। এঁদের অনেকে এখনও কাশীধামে বাস করছেন।

শ্রীখণ্ডের নাড়ুগোপাল

শ্রীখণ্ড।... ...

শ্রীখণ্ডের নরহরি ঠাকুরের নাম কে না জানে ?

নরহরি ঠাকুরের ভাইপো রঘুনন্দন।

রঘু মুকুন্দের পুত্র। সে নেহাৎ বালক।

মুকুন্দের আরাধ্য দেবতা শ্রীগোপাল।

মুকুন্দ একদিন স্থানান্তর যাবেন।

যাবার আগে তিনি পুত্র রঘুনন্দনকে ব'লে গেলেন—

রঘু, বাবা, আমাকে বাইরে যেতে হবে। গোপালের সেবা কোরো। দেখো, তাঁর সেবায় যেন কোনও ত্রুটি না হয়।

রঘুর আনন্দ আর ধরে না। সে ঠাকুর সেবাব ভাব পেয়েছে।

ভোগ সাজিয়ে রঘু গোপালের কাছে উপস্থিত হ'ল।

গোপালকে ভোগ নিবেদন ক'রে রঘু বলল- গোপাল, ধর। খাও।

রঘুর দৃঢ় বিশ্বাস গোপালকে খাবার দিলে সে নিশ্চয়ই খাবে।

তাকে কিছু খাবার দিলে সে কি খায় না ? না খেয়ে ফিরিয়ে দেয় ?

কিন্তু কোথায়, গোপাল যে কিছুই খায় না ! রঘু কাঁদতে লাগল।

তুমি খাবে না ? না খেলে বাবা আমাকে বকবেন। তিনি বলবেন, তুই গোপালকে কিছুই দিস নি। নিজেই সব খেয়েছিস।

রঘু গড়াগড়ি দিতে লাগল।

গোপাল নিরুপায়। কি আর করবেন ? পড়েছেন যে শক্ত লোকের পাল্লায়। দস্যুর কবলে। কাজেই গোপালকে খেতে হ'ল।

মুকুন্দ কাজ শেষ ক'রে ঘরে ফিরে এলেন।

রঘু, গোপালকে ভোগ নিবেদন ক'রেছ ?

হ্যাঁ বাবা।

প্রসাদ কোথায় রেখেছ ?

গোপাল সবই খেয়ে ফেলেছে।

বলছো কি ?

যে ভোগ গোপালকে দিয়েছিলাম, তার সবই গোপাল খেয়ে ফেলেছে।

রঘুর সরল মুখখানি দেখে মুকুন্দ বুঝলেন, সে মিছা কথা বলছে না। অথচ বিশ্বাসই বা করেন কি ক'রে ? এও কি সম্ভব ?

তুমি আবার খাওয়াও তো।

রঘুর ভারী স্ফূর্তি। এ তো আরও আনন্দের কথা।

আবার ভোগ প্রস্তুত হ'ল।

রঘু গোপালকে খাওয়াবে।

ভোগ সাজিয়ে মনের আনন্দে রঘু গোপালের কাছে গেল।

গোপাল খেতে হবে যে।

এবার রঘুর চোখে জল নেই। মুখে নেই কান্নার আভাষ। এবার হাসি। এবার আনন্দ। দৃঢ় বিশ্বাসের ছাপ মুখে-চোখে, সর্বাঙ্গে।

গোপাল, খাবার এনেছি, খাও

গোপালেরও কি কম আনন্দ ? আহ্লাদে আটখানা। গোপাল যেন নিতান্ত লোভী। বলা মাত্রই গোপাল খেতে শুরু করলেন।

রঘুর আনন্দের আর সীমা নেই।

মনের আনন্দে গোপাল খেয়ে চলেছেন।

রঘুর হঠাৎ মনে পড়ল বাবার কথা—তুমি আবার খাওয়াও তো!

বাবা, দেখে যাও। গোপাল খাচ্ছে।

ছুটে এলেন মুকুন্দ। ছুটে এলেন বাড়ীর আর আর লোকেরা —মেয়ে পুরুষ সবাই।

অমনি গোপালের খাওয়া বন্ধ হ'য়ে গেল।

তবে যে নাড়ুটি গোপাল মুখে দিতে যাচ্ছিলেন, সেটি তাঁর হাতেই র'য়ে গেল। মুখ পর্যন্ত আর উঠল না।

মুকুন্দ সব বুঝতে পারলেন। বুঝলেন, গোপাল শুধু পাথরের প্রতিমা নন। ইনি রূপময় প্রাণবান জীবন্ত বিগ্রহ।

কৃতকৃতার্থ হ'যে মুকুন্দ পুত্রকে জড়িয়ে ধরলেন। আনন্দে পুত্রকে কোলে ক'রে নাচতে লাগলেন।—

রঘু, আমার রঘু!

হতবুদ্ধি রঘু কিছুই বুঝতে পারে না - এর মধ্যে অস্বাভাবিক কাণ্ড কি ঘটে গেল!

তাকাল গোপালের মুখের দিকে। গোপাল হাসছেন

সে হাসি দেখে রঘুর মনে বল এলো। সেও হেসে ফেললো।

অচিরে দেশময় রাষ্ট্র হ'য়ে পড়ল এই বিস্ময়কর ঘটনা।

শ্রীখণ্ড একটি তীর্থে পরিণত হ'ল।

আজও সেই নাড়ু হাতে গোপাল অগণিত ভক্তজনকে আনন্দ বিলিয়ে চলেছেন।

শ্রীখণ্ড বর্ধমান জেলার একটি গণ্ডগ্রাম।

কুদি-মা

কুদি-মা-র বটতলা !

এ একটি নাম। খুলনা, যশোর এই সব জেলার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার কাছে এ একটি অতি পরিচিত নাম। প্রিয় নাম।

কে না জানে এর পিছন দিককার কাহিনী ?

জন কয়েক লোক এক পাল শুয়োর চরিয়ে বেড়াচ্ছিল।

বেশ কিছু দিন যাবতই চরাচ্ছে। কাল সেখানে আজ এখানে।

চরাতে চরাতে একদিন এসে পড়ল তিলক গ্রামের একটা প্রাচীন বটগাছের তলায়।

তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে।

তারা ভাবল আজকের রাতটা এই গাছটার নীচেই কাটিয়ে দেওয়া যাক। সামনে আছে পুকুর। এখানেই খাওয়া দাওয়া সেরে নিই। ভালোই হ'ল।

খাবার তো গামছাতেই বাঁধা রয়েছে। শুকনো চিঁড়ে আর খানকয়েক বাতাসা। পুকুর রয়েছে পাশে। চিঁড়ে খেয়ে জল খাও। তার পর শুয়ে পড়। বিছানার তোড়জোড় নেই। কোনও হৈ হাঙ্গামা নেই। শুয়ে পড় ঘাসের পরে—মাটি মায়ের কোলে।

তারা শুয়োরগুলিকে রাখল বটগাছের নীচে। তারপর একটু বিশ্রাম ক'রে হাতমুখ ধুয়ে নিল। চিঁড়ে খেল। পুকুরে গিয়ে জল খেল দুই আঁজলা ভ'রে। প্রাণটা ঠাণ্ডা হ ল। আঃ—।

এইবার ঘুমিয়ে পড়বে।

এমন সময়ে সেখানে একটি ছোট্ট মেয়ে এলো। কুদি।

স্থানীয় লোকেরা ছোট্ট মেয়েকে আদর ক'রে ডাকে 'কুদি' ব'লে।

কুদির পরনে লাল-পেড়ে একখানা শাড়ী।

গায়ের রঙ কালো। তা হোক। এই কালো রঙেই চারিদিক কেমন যেন আলো হ'য়ে উঠেছে। আর রূপ ? এমন রূপ তারা জীবনে দেখেনি। তারা কুদির মুখের পানে তাকিয়েই রইল।

চোখ আর ফিরাতে পারে না। পলক পড়ে না। সম্বিৎ হারালো নাকি?

তোমরা এখানে একপাল শুয়োর রাখলে কেন? সরিয়ে নাও।—কুদি বলল।

কি মিষ্টি কথা! হৃদয়ের সব তারেই বুঝি নাড়া পড়লো। লোক সব চুপ ক'রে রইল। মুখ দিয়ে কথা সরে না।

শুনছ? এখান থেকে শুয়োর সরিয়ে নাও। আর কোথাও রেখে এসো।

এতক্ষণে তাদের সম্বিৎ কিছুটা ফিরে এসেছে। কুদির কথা শুনতে পেল। বলে কি কুদি।

বলি শুনছ? তোমরা এখান থেকে যাও। শুয়োরের গন্ধে এক দণ্ডও তিষ্ঠোতে পারছি নে।

সারা দিনের ক্লান্তির পর ঘুমুতে যাচ্ছে, এমন সময়ে এই ধরনের কথা! তাদের মাথার রক্ত হঠাৎ যেন একটু গরম হ'য়ে উঠল। কথা তো বানিয়ে বলতে তারা শেখে নি।

তারা বলল, তিষ্ঠোতে না পারলে তুমিই এখান থেকে আর কোথাও যাও না। কে তোমায় সাধছে এখানে থাকতে?

বা-রে! আমি যে এখানে বহুদিন যাবত রয়েছি। এতদিনকার বাসা ছেড়ে আমি চলে যাবো! তা কি হয়? আমি বলছি, শুয়োর নিয়ে এখান থেকে চলে যাও।

আমরা যাবো না। না, কিছুতেই যাবো না।

যাবে না? বেশ!

কুদি চ'লে গেল।

লোকগুলোর মুখ থেকে একটা টানা দীর্ঘশ্বাস বেরুলো না? আপদ দূর হ'ল, না, আপনতম কেউ চ'লে গেলো। অন্তর খালি হ'ল বুঝি।

তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের মুখ দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগলো। ঝলকে ঝলকে। মলের সঙ্গেও রক্ত—শুধুই রক্ত।

একি হ'ল! হায় হায়!

প্রাণ যায়। সবাই ভয়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগলো। কে কাকে দেখে?

আবার এলো মেয়েটি।

তোমরা অমন করছ কেন? কি হয়েছে?

আর বাঁচিনে কুদি। বিদেশ বিভুঁই-এ এসে প্রাণটা বুঝি যায়।

তারা আর্তনাদ শুরু করলো।

একজন বলল, কুদি, তোমাকে দেখে পরাণটা কেমন করে উঠল। মনে হচ্ছে তোমার হাতেই আমাদের জীয়ন-কাঠি আছে। আর সইতে পারছিনে, কুদি। তুমি আমাদের বাঁচাও।

মেয়েটি হাসতে লাগলো। বড় মধুর হাসি! স্নিগ্ধ হাসি! বিশ্বভুবন নিমেষে জয় হয় যে হাসিতে, সেই হাসি!

হ্যাঁ মা, মন বলছে, তুমিই আমাদের বাঁচিয়ে তুলতে পারো। বাঁচাও মা, বাঁচাও আমাদের। আমাদের ঘর সংসার আছে। কাচ্চা বাচ্চা আছে।

কুদি হাসতেই লাগলো।

সে হাসি দেখে লোক কয়জন মনে বল পেল। তারা চেপে ধরল কুদিকে। বাঁচাও আমাদের, কুদি, বাঁচাও।

বলো, ভালো হ'য়ে উঠলে এখান থেকে শুয়োর নিয়ে চলে যাবে?

হ্যাঁ মা, যাবো। নিশ্চয়ই যাবো। তুমি আমাদের বাঁচাও।

তবে এক কাজ কর। ঐ পুকুরে যাও। গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে অঞ্জলি ভ'রে জল খেয়ে এসো।

কুদির কথায় আর মিষ্টি ব্যবহারে লোকেরা মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছে। বিশ্বাস হয়েছে পুরো।

দ্বিরুক্তি না ক'রে তখুনি তারা চ'লে গেল পুকুরে। হাতমুখ ধুয়ে আঁজলা ভ'রে আকণ্ঠ জল পান করলো।

কি আশ্চর্য !

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সবাই সুস্থ হ'য়ে উঠল। স্বস্তির পূর্ণতায় দু চোখ ভ'রে জল এলো। তারা কুদির পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

তুমি কুদি যে-সে লোক নও। বল কুদি, তুমি কে? তোমার পরিচয় দাও। আমরা মুখ্খু মানুষ। জ্ঞানগম্যি নেই। না জেনে না বুঝে তোমায় উপহাস করেছি। তোমার কথা অমান্য করেছি। দোহাই কুদি, কৃপা কর। আমাদের 'পরে রাগ কোরো না।

না বাবা, রাগ করবো কেন? তোমরা ভালো হয়ে গিয়েছো। এইবার এসো।

কুদি, দোহাই কুদি, তোমার পরিচয় আমাদের দাও। মন বলছে, তুমি আমাদের আপন হতেও আপন। সব চেয়ে আপন।

কুদি নিজের পরিচয় দিলেন।

আমি তোমাদের সকলেরই মা। তোমরা যে কালী মায়ের পূজো কর, আমি সেই। বহুদিন যাবত এখানে বাঁধা পড়ে আছি। এই জায়গার মায়া ছাড়তে পারিনে। এই পুকুর, এই বটগাছ, আশে পাশের এই সব ঠাঁই, এ সবই আমার প্রিয়, অতি প্রিয়।

তারা মায়ের চরণে আবার লুটিয়ে পড়ল।

মা, মাগো, দিনরাত আমাদের পোড়া অদেষ্টকে দোষ দিই। সবাই আমাদের ঘেন্না করে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্ল করে। প্রাণ ভ'রে দুমুঠো খেতে পেলাম না। আজ পর্যন্ত পরণে একখানা পুরো কাপড় জুটলো না। জীবনে সুখের মুখ দেখলাম না। ভাবতাম কত পাপ করেছি, তা-ই এই হাল। কিন্তু মা, মিথ্যে, মিথ্যে, সব মিথ্যে। আমাদের মতো ভাগ্য আর কার? আমরা তোমার দেখা পেলাম। জন্ম-জন্মান্তরে কত পুণ্য যে করেছি তার কি কিনারা আছে? মা, মাগো!

আনন্দের আকুলতায় দুই চোখ দিয়ে ফোয়ারার মতো জল ছুটলো।

ভারী গলায় চেঁচিয়ে উঠল, ওরে, ভাখ ভাখ, সবাই এসে

ত্যাখ, আমাদের মায়ের অপার করুণা দেখে যা। সারা দুনিয়ার মা যিনি, তাঁর কাছে ছোটলোক বড়লোক বিচার নেই, বামুন চাঁড়ালের ভেদাভেদ নেই, পণ্ডিত মুখ্খুর তারতম্য নেই। যদি এক কড়িও থাকত, তবে এই দুনিয়ার ঈশ্বরীকে, যাঁকে কেবলমাত্র বামুনরাই পূজো করে, আমরা দেখতে পেতাম? ঘুমের ঘোরে নয়, স্বপ্নে নয়, মুখোমুখি, সামনা সামনি?

চোখের জলে মাটি ভিজিয়ে কাঁদা ক'রে দিল।

তোমরা যাও। গাঁয়ের সবাইকে বোলো এই জায়গার মাহাত্ম্যের কথা। তারা জানে না। তাদের বোলো, এই বটতলায় আমার নিত্য অধিষ্ঠান। এই পুকুরের জল আমি নিত্য পান করি।

কুদি অন্তর্হিতা হলেন।

নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল এই কাহিনী। এই বটতলা, এই পুকুর, এই কুদি-মায়ের মাহাত্ম্যের কথা।

দলে দলে কাতারে কাতারে ছুটে এলো স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ।

মা দেখা দিয়েছেন! মা দেখা দিয়েছেন।

সবাই বটতলায় লুটিয়ে পড়লেন। গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। আঁজলা ভ'রে পুকুরের জল পান করলেন। বটগাছ স্পর্শ ক'রে প্রণাম করলেন।

মা, মা!

মহা আড়ম্বরে গাঁয়ের লোক সেইখানে বটগাছের নীচে মায়ের পূজা করলেন।

দূর-দূরান্তর থেকেও অগণিত লোক এলেন সেই পূজা দেখতে।

এই স্থান, এই বটতলা—তীর্থে পরিণত হ'ল।

কুদি মা-র বটতলা।

সেই অবধি প্রতি বৎসর এখানে পূজা হয়। এক বৎসরও বন্ধ হয় নি।

জেলার সব গাঁয়ের বারোয়ারি কালী ও শীতলা পূজা শেষ হ'লে তবে এখানকার পূজা হয়। পূজা হয় জৈষ্ঠ মাসের কোনও এক শনি বা মঙ্গলবারে।

পূজার সময় হাজার হাজার লোক সমবেত হন। সবারই ধারণা মা রক্ত ভালবাসেন। তাই এখানে অজস্র ছাগবলি দিয়ে মায়ের পূজা হয়। এখনও হয়। আগে প্রচুর মোষও বলি দেওয়া হোতো। এখন হয় না বললেই হয়।

সবারই ধারনা কুদি-মা বড়ই জাগ্রতা দেবী। এখানে এসে কুদি মা-র পূজা দিলে মনষ্কামনা পূর্ণ হয়। এই বিশ্বাস লক্ষ লক্ষ লোকের। এ বিশ্বাস এখনও একটুও শিথিল হয় নি।

কুদি-মা-র বটতলা তিলক গ্রামে অবস্থিত। তিলক গ্রাম খুলনা বাগেরহাট রেলপথে কর্ণপুর স্টেশনের অতি নিকটে।

এই গ্রামের ও আশে পাশের দু চার গ্রামের—শ্রীরামপুর, নৈহাটী, লখপুর বাঐডাঙ্গা, পীলজঙ্গ, নওয়াপাড়া, প্রভৃতি গ্রামের জনসাধারণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হ'ল, কুদি মা র পূজার সময়ে হাজার হাজার পুণ্যার্থী এখানে এলে এখানকার অধিবাসীরা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে নিজেদের গৃহে স্থান দেন, যার যেমন সাধ্য অতিথি সেবা করেন। বিরক্তির সঙ্গে নয়, আনন্দের সঙ্গেই, নিষ্ঠার সঙ্গেই, কর্তব্য বোধেই। এ যেন কুদি মা র পূজার একটা অঙ্গ।

এ ধারা আজও অব্যাহত।

অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নীলাচল থেকে বৃন্দাবন চলেছেন। সঙ্গে তাঁর বহু লোক।

মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত গোবিন্দ ঘোষও সঙ্গে চলেছেন। মহাপ্রভুর সেবার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত।

একদিন পথে মহাপ্রভু ভিক্ষা (ভোজন) ক'রে মুখশুদ্ধির জন্যে হাত বাড়ালেন। গোবিন্দ ছিলেন পাশে। ঈঙ্গিত বুঝতে পেরে তিনি গাঁয়ে ছুটলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি হরীতকী এনে তার কিছুটা ধরলেন মহাপ্রভুর সুমুখে।

পরদিন মহাপ্রভু সদলবলে এসে পৌছুলেন অগ্রদ্বীপে। সেদিনও দুপুরে ভিক্ষা-অন্তে মুখশুদ্ধির জন্যে তিনি হাত বাড়ালে গোবিন্দ তক্ষুনি তাঁকে মুখশুদ্ধি দিলেন।

মহাপ্রভুর সন্দেহ হ'ল।

গোবিন্দ, কাল মুখশুদ্ধি চাইলাম। তা দিতে তোমার বেশ খানিকটা বিলম্ব হ'ল। কিন্তু আজ চাইতে না চাইতেই আমাকে মুখশুদ্ধি দিলে!

প্রভু, কাল গাঁয়ে গিয়ে একটা গোটা হরীতকী আনি। তার কিছুটা আপনাকে দিয়েছিলাম। আজও আপনার দরকার হবে মনে ক'রে বাকীটা বহির্বাসে বেঁধে রেখেছিলাম।

করেছ কি গোবিন্দ! বৈষ্ণব হ'য়ে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করেছ? বৈষ্ণবের বিধি লঙ্ঘন করলে? তোমার তো এখনও সঞ্চয়-বাসনা যায় নি!

গোবিন্দ মাথা নীচু ক'রে রইলেন।

কঠোর হলেন মহাপ্রভু।

আজ থেকে আমার সঙ্গে থাকা আর তোমার চলবে না। না।

মর্মভেদী এই আদেশ শুনে গোবিন্দের মাথায় যেন বাজ পড়ল!

আমি অপরাধ করেছি। আমায় ক্ষমা করুন, প্রভু।

গোবিন্দ আর্তনাদ করতে লাগলেন।

তা হ'তে পারে না, গোবিন্দ। আমার সঙ্গীদের মধ্যে কাউকে সঞ্চয়ী দেখলে লোকে বলাবলি করবে, আমি গৃহ ত্যাগ করলেও গৃহীর আচার, ধর্ম ছাড়তে পারিনি। না না, এ কাজ বৈষ্ণবজনোচিত নয়

গোবিন্দের আর্তনাদ থামে না। তিনি বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলেন।

মহাপুরুষের চরিত্র বজ্রের চেয়ে কঠোর—আবার কুসুমের চাইতেও কোমল।

নরম হ'ল মহাপ্রভুর মন।

দুঃখ কোরো না, গোবিন্দ। তুমি আমার প্রিয় পাত্র একান্ত আপন জন। তোমাকে দিয়ে ভবিষ্যতে আমি অনেক কাজ করাতে চাই। তুমি এখানেই থাক। তোমার ভবিষ্যৎ কর্তব্য আমি তোমাকে শীঘ্রই জানাব।

আশ্বস্ত হলেন না গোবিন্দ। তিনি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন।

শান্ত হও, গোবিন্দ। আমি আবার তোমার কাছে আসবো। সেবার এসে আর তোমাকে ছেড়ে যাবো না। তুমি এই অগ্রদ্বীপেই আমার জন্য অপেক্ষা কর।

মহাপ্রভু অগ্রদ্বীপ ত্যাগ করলেন।

গোবিন্দ অগ্রদ্বীপেই র'য়ে গেলেন।

প্রভু আবার আসবেন। সেবার এসে আর আমাকে ছেড়ে যাবেন না। দিবানিশি তাঁর কাছে থেকে তাঁর সেবা কোরবো। এই আশা সম্বল ক'রে গোবিন্দ মহাপ্রভুর অপেক্ষা করতে লাগলেন।

গঙ্গাতীরে ক্ষুদ্র একখানি পাতার কুটির নির্মিত হ'ল। দিনরাত সেই কুটিরে অথবা গঙ্গাতীরে গোবিন্দ ভজন করতে লাগলেন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

প্রিয়তম কবে আসবেন? কবে সেই নয়নানন্দনন্দনের চাঁদবদন আবার দেখবেন? আবার কবে তার মধুরতম আহ্বান শুনবেন?

শুরু হ'ল শবরীর প্রতীক্ষা।

একদিন গোবিন্দ গঙ্গাতীরে ব'সে ভজন করছেন। এমন সময়ে তার গায়ে কালো কি একটা জিনিস এসে ঠেকলো। ভজন শেষ হ'লে গোবিন্দ চোখ মেলে তাকালেন। মনে হ'ল, হয়তো বা পোড়া কাঠ। তিনি জল থেকে সেখানিকে উঠিয়ে ডাঙ্গায় রেখে দিলেন।

নিশুতি রাত। চারিদিক নিস্তব্ধ। ঘুমিয়ে রয়েছেন গোবিন্দ। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল।

গোবিন্দ যেন স্পষ্ট শুনতে পেলেন, তারই পরমপ্রিয় শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র তাঁকে ধীরে ধীরে ডাকছেন।

গোবিন্দ! গোবিন্দ!

উৎকর্ণ হলেন গোবিন্দ।

গোবিন্দ, তুমি যাকে পোড়াকাঠ মনে ক'রে ডাঙ্গায় উঠিয়ে রেখেছো, ওটিকে পরম যত্নে কুটিরে নিয়ে এসো। আমি আসছি।

ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করলেন না। ঝটিতি গেলেন গোবিন্দ গঙ্গাতীরে। দেখতে পেলেন স্বপ্নবর্ণিত সেই দুর্লভ সামগ্রী।

জয় মহাপ্রভু!

অসীম ভক্তিভরে মাথায় ক'রে নিয়ে এলেন সেই অমূল্য সম্পদ।

দিনের আলোয় ভাল ক'রে দেখলেন, ওখানি পোড়াকাঠ নয়, একখানি সুন্দর কালো পাথর।

গোবিন্দের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল।

তাঁর মনে নিশ্চিত ধারণা হ'ল, প্রভু আসবেন।

গোবিন্দ প্রিয়তমের আসার আশায় রইলেন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

কিছুকাল পরে একদিন মহাপ্রভু সত্যসত্যই গোবিন্দের কুটিরে এলেন। সঙ্গে বহু লোক।

গোবিন্দ আমি এসেছি।

এসেছেন! প্রভু এসেছেন!

গোবিন্দ মহাপ্রভুর পদতলে দীঘল হ'য়ে লুটিয়ে পড়লেন। আনন্দের পরিপূর্ণতায় চোখের জল অবাধে ছুটলো। ধুয়ে দিল দুখানি রাতুল চরণ।

মহাপ্রভুর শুভ আগমন বার্তা নিমেষে সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল। নিমেষে গোবিন্দের কুটিরে অসংখ্য লোক সমবেত হল।

সেদিন গোবিন্দের কুটিরে মহোৎসব।

ভিক্ষা অন্তে মহাপ্রভু গোবিন্দকে একান্তে জিজ্ঞাসা করলেন, গোবিন্দ, পাথরখানি পেয়েছো তো?

পেয়েছি, প্রভু।

আগামীকাল ঐ পাথরখানি দিয়ে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবো।

পরদিন একজন সুনিপুণ ভাস্কর আপনিই এসে সেখানে উপস্থিত হলেন। প্রণাম করলেন মহাপ্রভুকে।

মহাপ্রভু তাঁকে শ্রীমূর্তি নির্মাণ করতে বললেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশ তিনি নিজেই দিলেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই ভাস্কর মনোহর এক মূর্তি গ'ড়ে তুললেন।

সেদিন গোবিন্দের কুটিরে অসংখ্য লোক সমাগমের মধ্যে মহাপ্রভু সেই শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন

বিগ্রহের নাম রাখলেন শ্রীগোপীনাথ

মহাপ্রভু বললেন, গোবিন্দ, এই ঠাকুর তোমায় দিলাম। আমি বলেছিলাম,' আমি আবার তোমার কাছে আসবো। এসে আর

তোমাকে ছেড়ে যাবো না। এই তো আমি এখন থেকে তোমার কাছেই রইলাম।

গোবিন্দের মন সমর্পিত শ্রীগৌরাঙ্গ চরণযুগলে। তিনি বেশ জানেন এই শ্রীগোপীনাথ আর শ্রীগৌরাঙ্গ এক, অভিন্ন। এই দুইয়ে কোনও প্রভেদ নেই। তবুও গোবিন্দের মন প্রবোধ মানলো না। মুখে তাঁর হাসি ফুটলো না।

শ্রীহনুমান জানতেন, শ্রীনাথ আর জানকীনাথ অভিন্ন। তবুও তাঁর সর্বস্ব ছিলেন জানকীনাথ শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীনাথ নয়।

গোবিন্দ কাঁদতে লাগলেন।

মহাপ্রভু তাঁকে আশ্বস্ত করলেন

গোবিন্দ, তুমি এখানেই থাক। এখানে থেকে শ্রীগোপীনাথের সেবা কর। এঁকে সেবা করলেই আমার সেবা করা হবে।

মাথা নীচু ক'রে রইলেন গোবিন্দ।

তোমাকে দিয়ে ভগবান দেখাবেন তিনি কত ভক্তবৎসল। তোমাকে দিয়ে তাঁর অপার করুণার কথা তিনি জগতে প্রচার করবেন।

মহা ভাগ্যবান তুমি, গোবিন্দ। এই দুর্লভ অপার সৌভাগ্য তুমি উপেক্ষা কোরো না।

তুমি এখানেই থাক। বিবাহ কর।

এই কথা ব'লে মহাপ্রভু চ'লে গেলেন।

গোবিন্দ শ্রীগোপীনাথের পদতলে লুটিয়ে পড়লেন।

প্রভু! প্রভু! প্রভু!

তাই হোক। তোমার আজ্ঞাই পালন করবো। আজ থেকে শ্রীগোপীনাথই আমার হৃদয়দেবতা।

গোবিন্দ শ্রীগোপীনাথের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করলেন। স্থায়িভাবে র'য়ে গেলেন অগ্রদ্বীপে।

গোবিন্দ বিবাহ করলেন। স্বামী-স্ত্রী দুইজনে মিলে পরম নিষ্ঠা

ও ভক্তির সঙ্গে শ্রীগোপীনাথের সেবা করেন। শ্রীগোপীনাথের প্রসাদ পেয়ে দুইজনে মনের আনন্দে দিন কাটিয়ে দেন।

কিছুকাল পরে গোবিন্দের একটি পুত্র সন্তান হ'ল।

কিন্তু পুত্রটিকে রেখে গোবিন্দের স্ত্রী মারা গেলেন।

অতীব দুঃখের কথা। তবুও শোকে অভিভূত হলেন না গোবিন্দ।

তাঁর কানে তখনও অনুরণিত হচ্ছে মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী—

এখানে থেকে শ্রীগোপীনাথের সেবা কর। এঁকে সেবা করলেই আমার সেবা করা হবে। ······

গোবিন্দ আরও নিষ্ঠা, আরও ভক্তির সঙ্গে শ্রীগোপীনাথের সেবা করতে লাগলেন।

তাঁর উপর এখন দুই ভার পড়েছে।

শ্রীগোপীনাথের সেবা করতে হবে। আপন মাতৃ-হারা শিশু-পুত্রটিকে পালন করতে হবে।

এই দুই কাজে সারা দিনমান গোবিন্দের কেটে যায়। তিনি তন্ময় হয়ে থাকেন। অভাব অনটন?—এহো বাহ্য।

দিন যায়।

একটি বছর, দুটি বছর ক'রে চারটি বছর গড়িয়ে গেল।

গোবিন্দের পুত্রের বয়স এখন পাঁচ।

এই পাঁচ বছরে গোবিন্দেরও বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

গোবিন্দের চোখে শ্রীগোপীনাথ এখন যেন তাঁরই একটি পুত্র। ঐ পাঁচ বছরেরই একটি পুত্র।

গোবিন্দ শ্রীগোপীনাথকে নিজের দ্বিতীয় শিশুপুত্র ভাবেই সেবা করতে লাগলেন।

এদিকে কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন যেন গোলমাল হ'তে লাগল।

গোবিন্দের মন দুইজনে সমান তালেই আকর্ষণ ক'রে চলেছে।

একজন হোলেন শ্রীগোপীনাথ। অপরজন গোবিন্দের পাঁচ বছরের শিশুপুত্র।

একজনকে খাওয়াতে গেলে গোবিন্দ ভাবেন, অপর জনের বুঝিবা মুখ ভার হ'ল। অপরজনকে খাওয়াতে গেলে, গোবিন্দের মনে হয়, ও আবার অভিমান কোরলো নাকি! একজন তুষ্ট হ'লে অপরে রুষ্ট হয়। অপরে তুষ্ট হ'লে অন্যজন রুষ্ট হয়।

কখনও পুত্রকে খাওয়াতে গিয়ে সেই খাবার পুত্রকে না দিয়ে গোবিন্দ তুলে ধরেন শ্রীগোপীনাথের মুখে। কখনও বা শ্রীগোপীনাথের খাবার তাঁকে না খাইয়ে খাওয়ান নিজের পুত্রকে। কোনও দিন পুত্রের জন্যে আনা অলঙ্কার পরান শ্রীগোপীনাথকে। কোনও দিন বা শ্রীগোপীনাথের অলঙ্কারে সাজিয়ে তোলেন নিজের পুত্রকে। কখনও নিজ পুত্রকে ডাকতে গিয়ে ডাকেন শ্রীগোপীনাথকে। আবার কখনও বা শ্রীগোপীনাথকে ডাকতে গিয়ে ডেকে বসেন নিজের পুত্রকে।

এই ভাবেই দিন কাটতে লাগল।

হঠাৎ এর মধ্যেই একদিন লীলাময় নোতুন এক লীলা ক'রে বসলেন। তিনি গোবিন্দের পুত্রটিকে আচম্বিতে সরিয়ে নিলেন।

শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন গোবিন্দ।

হায় হায়! একি করলে ঠাকুর! একি করলে!

গোবিন্দ সংকল্প করলেন, শ্রীগোপীনাথের সেবা আর তিনি করবেন না। প্রাণও আর রাখবেন না। শ্রীগোপীনাথের ঘরে উপোসী থেকে শ্রীগোপীনাথের চোখের সামনেই প্রাণত্যাগ করবেন।

বড় অভিমান হ'ল গোবিন্দের। অভিমান করলেন শ্রীগোপীনাথের 'পরে।

ঠাকুর, কায়মনোবাক্যে দিবানিশি তোমার সেবা ক'রে চলেছি। সেই তুমি-ই কিনা স্বচ্ছন্দে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলে

আমার প্রাণদুলালকে! একটুও বাধলো না তোমার? এত নির্দয়, এত নিষ্ঠুর তুমি?

বেশ! আমিও দেখাই, আমি নিষ্ঠুর হ'তে পারি কি না! পারি কি-না তোমাকেও শাস্তি দিতে!

গোবিন্দ শুয়ে রইলেন শ্রীগোপীনাথের ঘরে। নড়াচড়া পর্যন্ত করেন না খাওয়া-দাওয়ার তো কথাই নেই।

সে দিন আর শ্রীগোপীনাথের সেবা হ'ল না।

উপোসী রইলেন শ্রীগোপীনাথ।

গোবিন্দ মাঝে মাঝে অপাঙ্গে চেয়ে দেখেন শ্রীগোপীনাথকে। ক্ষুধায় শ্রীগোপীনাথের কেমন অবস্থা হয়েছে দেখি।

বেশ হয়েছে। আমার বুকে শেল হেনেছ। আজ থেকে তোমার খাওয়া বন্ধ। দেখি, কে খেতে দেয় তোমাকে। আর, আমিও তোমার সামনে না খেয়ে মরবো। তুমিও বোঝ একবার, তোমার বুকে কতটা লাগে!

গোবিন্দ শুয়েই রইলেন।

রাত্রি হয়েছে। গভীর রাত্রি।

গোবিন্দ শুনতে পেলেন, শ্রীগোপীনাথ তাঁকে ধীরে ধীরে ডাকছেন।—বাবা, বাবা!

গোবিন্দ চুপ ক'রে রইলেন। কথাটি কইলেন না।

বাবা! বাবা!

গোবিন্দ তখনও কথা কইলেন না।

বাবা, তোমার প্রাণে কি একটুও দয়া মায়া নেই? সারাটি দিনের মধ্যে কিছুই আমাকে খেতে দাও নি! এক ফোঁটা জলও দিলে না! আমার কি ক্ষুধা পায় না? তৃষ্ণাও লাগে না?

দেখ, আমার বুকের পাঁজর ভেঙ্গে গেছে। আমার আর শক্তি-সামর্থ্যও নেই, যে তোমার সেবা কোরবো। শোকে আমি অভিভূত

হ'য়ে প'ড়েছি। আঁধার দেখছি চারদিক। আমাকে দিয়ে তোমার সেবা আর চলবে না। আজ থেকে তোমার ব্যবস্থা তুমি নিজেই কর।

গোবিন্দ পাশ ফিরে শুলেন।

বাবা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। যদি কোনও লোকের দুটি পুত্র থাকে, আর, তাদের মধ্যে দৈবাৎ একটি পুত্র মারাই যায়, তবে সে কি শোকে অভিভূত হ'য়ে আর একটি পুত্রকে না খাইয়ে মেরে ফেলে?

তুমি তো জান, তোমার দুই পুত্র। এক পুত্র গিয়েছে। তার জন্যে শোক স্বাভাবিক। শোক প্রকাশ কর। কিন্তু তাই ব'লে আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ? আমি কতদিন উপোসী থাকব?

দ্যাখ ঠাকুর, তুমি মিছামিছি আমাকে 'বাবা, বাবা' বলছ। এ তোমার ছল। এ তোমার বাহ্য কথা। তা না হ'লে আমার বুকের নিধিকে আমারই বুক থেকে ছিনিয়ে নিলে! একটুও বাধলো না! দয়া হ'ল না তোমার! জানতো, আমি ছিলাম ওর মা, বাপ, একাধারে সবই।

দুঃখ কোরো না, বাবা। এমন ধারা দুঃখ মানুষমাত্রেই পেয়ে থাকে! আর, তা ছাড়াও, শোন। আমি বলছি, তুমি নিশ্চিন্ত হও। তোমার পুত্রের উত্তম গতি হয়েছে। সে মহা ভাগ্যবান।

বেশ। তুমি যখন বলছ, তখন নিশ্চয়ই বিশ্বাস করলাম, আমার পুত্রের সদ্‌গতি হয়েছে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমাকে কেন এই পুত্রশোক দিলে? কেন দিলে নিদারুণ এই কষ্ট?

বাবা, তোমাকে একটি অতি গুহ্য কথা বলি, শোন। যার দুই পুত্র, সে বাপের এক পুত্র হ'তে আমার সাধ হয় না। তুমি ছিলে বাপ, আমি ছিলাম তোমার একমাত্র পুত্র। সে তো বেশ ছিল। কিন্তু শেষে তোমার আর একটি পুত্র হ'ল। আমি হলাম দুটির মধ্যে একটি। সে ক্ষেত্রে আমি আর তোমার কাছে রইতে পারিনে। তখন আমি যদি তোমায় পরিত্যাগ ক'রে চলে যেতাম, তুমি বাঁচতে না। ফলে, তুমিও যেতে, আর, তোমার পুত্রকেও হারাতে।

কিন্তু আজ? আজ তোমার ঐ পুত্রটিকে হারিয়ে আমাকে আরও বেশী ক'রে পেলে। আর, তোমার ঐ পুত্রটিকেও ভালভাবে পাবে!

ওঠ, বাবা, ওঠ। দুঃখ কোরো না। শোক দূর কর। তোমার এক পুত্র গিয়েছে, আমি তো রয়েছি।

অনেকটা আশ্বস্ত হলেন গোবিন্দ। কৃপা পেলেন অপার। কিন্তু আরও আদায় ক'রে নিতে ছাড়বেন কেন? অন্তরে উল্লাস, মুখে তখনও কিছুটা যেন বিমর্ষতা।

হ্যাঁ, তুমি আমার পুত্র। এমন পুত্র আর কারও হয় না, সর্বাঙ্গসুন্দর পুত্র! সে কথা স্বীকার করলাম। তবে একটা কথা বলবো? তুমি কি পুত্রের সব কাজই করবে? আমি মারা গেলে করবে আমার শ্রাদ্ধ? বল! বল!

ছাখ, তুমি আমার বাপ। আমি তোমাব পুত্র। শ্রাদ্ধাদি কাজ সাত্ত্বিক কাজ নয়, এসব রাজসিক কাজ। তবুও বাবা হ'য়ে যখন নিজের মুখে পুত্রকে শ্রাদ্ধ করবার কথা জানালে, তখন আমিও অঙ্গীকার করলাম, আমি শাস্ত্রমত তোমার শ্রাদ্ধ করবো। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

এবাব গোবিন্দ আর কি বলবেন? বলবার যে আর কিছুই বাকী রইল না। মুখ বন্ধ হ'ল। কিন্তু চোখ দুটি তো বাধা মানলো না। আনন্দের আতিশয্যে জলধারা অবাধে ছুটলো। গোবিন্দ কাঁদতে লাগলেন।

আজ গোবিন্দ সত্যই বুঝলেন তাঁর মতো ভাগ্য আর কার আছে? এমন পুত্ররত্ন আর কার ভাগ্যে জুটেছে?

মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো—

আমার এক পুত্র গিয়েছে। বেশ হয়েছে। ভালই হয়েছে।

গোবিন্দ উঠলেন। তাঁর শ্রীগোপীনাথ উপোসী রয়েছেন যে!

ঠাকুর, একটু অপেক্ষা কর। আমি তোমার সেবার ব্যবস্থা এক্ষুনি ক'রে ফেলছি। একটুও বিলম্ব হবে না। রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটি।

এ ঘটনার কিছুদিন পরে গোবিন্দ দেহরক্ষা করলেন।

দেহত্যাগের আগে তিনি শ্রীগোপীনাথকে তাঁর এক সেবাইতের হাতে সমর্পণ ক'রে গেলেন।

গোবিন্দ দেহরক্ষা করেছেন।

অনুগত ভক্তজনেরা কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে লাগলেন শিষ্যজনেরা। শ্রীগোপীনাথও কাঁদতে লাগলেন। বহুলোক স্পষ্ট দেখতে পেলেন, শ্রীগোপীনাথের দুই চোখ বেয়ে বিন্দু বিন্দু জল মুক্তার পর মুক্তার মতো গড়িয়ে পড়ছে।

বাপ মারা গেলে ছেলে কাঁদে। গোবিন্দ বাপ, গোপীনাথ ছেলে। গোপীনাথ কাঁদবেন না?

উপস্থিত সবাই ভাবে অভিভূত হ'য়ে পড়লেন। সবাই সমস্বরে শ্রীগোপীনাথের জয় ধ্বনি ক'রে উঠলেন।

জয় শ্রীগোপীনাথ! জয় শ্রীগোপীনাথ!

সেদিন রাত্রে নতুন সেবাইত স্বপ্নে আদেশ পেলেন। শ্রীগোপীনাথ তাঁকে বলছেন, গোবিন্দ আমার বাপ। আমি তাঁর পুত্র। তিনি দেহরক্ষা করেছেন! আমি পুরা অশৌচ পালন কোরবো আর হবিষ্যান্ন গ্রহণ কোরবো। তোমরা আমাকে স্নান করিয়ে সময়োচিত নূতন কাপড় পরিয়ে দাও। আমি অশৌচকালে কাচা প'রে থাকবো। এসবের তুমি ব্যবস্থা কর।

সেবাইত অবাক! শ্রীগোপীনাথকে কি ক'রে, কোন প্রাণে কাচা পরাবেন? হবিষ্যান্ন খাওয়াবেন? লোকে বলবে কি!

আমি আমার বাপ গোবিন্দের কাছে অঙ্গীকারে আবদ্ধ রয়েছি। আমি তাঁর শ্রাদ্ধ কোরবো। তাই তোমাকে বলছি—যথাকালে শ্রাদ্ধের আয়োজন কর। আমি সকলের সামনেই তাঁর শ্রাদ্ধ কোরবো।. নিজ

হাতে তাঁর পিণ্ডদান কোরবো। তুমি আমার আজ্ঞামত কাজ কর। তোমার কোনও শঙ্কা নেই।

রাত্রি প্রভাত হ'ল। সেবাইত সবাইকে এই মধুর স্বপ্নের বৃত্তান্ত জানালেন। জানালেন শ্রীগোপীনাথের অভূতপূর্ব নির্দেশ।

সকলে মহা ভাগ্যবান গোবিন্দকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন।

শ্রীগোপীনাথের নির্দেশমত সব ব্যবস্থাই করা হ'ল।

চৈত্র মাসে কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে গোবিন্দের শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হ'ল। অগণিত লোক সে অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন।

শ্রাদ্ধ তো নয়। সে এক বিপুল সমারোহ। সে এক মহামহোৎসব।

সুসজ্জিত শ্রাদ্ধবাসর।

সেই সজ্জিত মণ্ডপে শ্রাদ্ধ-বেদীতে কাচা পরা অবস্থায় শ্রীগোপীনাথকে এনে সকলে বসিয়ে দিলেন।

জয় গোপীনাথ! জয় গোপীনাথ!

সে এক অপূর্ব দৃশ্য! অপূর্ব পরিবেশ! দেবতা আজ মানুষের মাঝে মানুষ পিতার জন্যে স্বয়ং শ্রাদ্ধ করতে এসেছেন! গলায় কাচা পরেছেন! স্বয়ং পিণ্ডদান করছেন!

ওরে, কে কোথায় আছ, ছুটে এসো! দেখবে এসো দয়াল ঠাকুরের মধুর লীলাবিলাস!

সবাই দেখলেন। সমবেত সবাকার সম্মুখে শ্রীগোপীনাথ স্বহস্তে গোবিন্দ ঘোষের পিণ্ডদান করলেন।

আর, পিণ্ডদানের সময়ে শ্রীগোপীনাথের দুই চোখ বেয়ে মুক্তাধারার মতো অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে।

অভাবনীয় এই কাণ্ড দেখে সবাই ভাবে অভিভূত হ'য়ে পড়লেন।
সকলেরই মুখে অপার আনন্দ, চোখে অবাধ জল।
সর্বত্র অসীম সৌভাগ্যের প্রসন্নতা, পরিতৃপ্তি সর্বত্র।

কেহ গেবিন্দকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। কেহ শ্রীগোপীনাথের জয়গান গাইতে লাগলেন। কেহ অগ্রদ্বীপকে মহাতীর্থ মনে ক'রে ভূমে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। তীর্থরজঃ অঙ্গে মেখে পবিত্র হবার জন্যে চারিদিকে ধূম প'ড়ে গেল।

যেমন ঠাকুর তেমন ভক্ত! যেমন ভক্ত তেমন ঠাকুব!

প্রতি বৎসর এই অপূর্ব লীলাকাহিনী স্মরণ ক'রে অগ্রদ্বীপে এখনও উৎসব হ'য়ে থাকে। সারা দেশের অগণিত লোক প্রতি বৎসর এই সময়ে অগ্রদ্বীপে এসে পবিত্র হন, ধন্য হন।

অগ্রদ্বীপ ভাগীরথী তীরে অবস্থিত বর্ধমান জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম।

দেহি পদপল্লব

কবি জয়দেব।

যিনি কোমলকান্ত পদাবলী গীতগোবিন্দ লিখে অমর হয়েছেন। সেই জয়দেব।

আমাদের দেশে জয়দেব আর তাঁরই লেখা গীতগোবিন্দের নাম শোনেন নি, এমন কে আছেন?

পদ্মাবতী জয়দেবের ঘরনী।

পদ্মাবতীর নামও আমাদের দেশের ঘরে ঘরে।

পদ্মাবতী অতি বিদুষী মহিলা। তাঁর মতো নর্তকী এদেশে বিরল। তিনি সুগায়িকাও।

দেশবিদেশ হতে বড় বড় গায়ক আসেন। পদ্মাবতীর গান শুনে তাঁরা হার মানেন। আর পদ্মাবতীকে নমস্কার ক'রে বিদায় হন।

গান্ধার রাগে গান গেয়ে পদ্মাবতী কপিলেশ্বরের সভাজয়ী সঙ্গীতাচার্যকে জয় করেন।

স্বয়ং জয়দেব পদ্মাবতীর তাল রাখেন চরণের গতির ক্রম লক্ষ্য ক'রে। নিজের পরিচয় দেন পদ্মাবতী-চরণচারণ চক্রবর্তী ব'লে।

জয়দেব ছিলেন বাঙলার রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি। লক্ষ্মণ সেন গুণের আদর করতেন। তিনি জয়দেব আর পদ্মাবতীকে অশেষ সম্মান দেখিয়ে রাজসভায় রেখেছিলেন।

এই পদ্মাবতী আর জয়দেব।

একজন নর্তকী আর গায়িকা।

অন্যজন কবি আর গায়ক।

সব চেয়ে বড় কথা, দুজনেই বড় ভক্ত।

বীরভূম জেলায় কেন্দুবিল্ব গ্রাম।

আজকাল যে গ্রামের নাম কেন্দুলি—জয়দেব-কেন্দুলি। এই গ্রামেই জয়দেবের জন্ম।

যৌবনে একদিন নীলাচলে গিয়ে তিনি শ্রীজগন্নাথের শরণাগত হন।

জয়দেব নীলাচলে বৃক্ষতলে বাস করেন। সম্বলহীন। সংসারে বিরক্ত তিনি। তিনি জিতেন্দ্রিয়।

সে সময়ে এক নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ কায়মনোবাক্যে শ্রীজগন্নাথের সেবা করতেন।

একদিন শ্রীজগন্নাথের কাছে তিনি সন্তান প্রার্থনা করলেন।

প্রভু, আমার কন্যা বা পুত্র যাই হোক না কেন তাকে তোমার চরণে নিবেদন কোরবো।

শ্রীজগন্নাথ ব্রাহ্মণের প্রার্থনা শুনেছিলেন। যথাকালে তাঁর একটি কন্যা হ'ল। নাম পদ্মাবতী।

বয়স হ'লে পূর্বকথা স্মরণ ক'রে ব্রাহ্মণ পদ্মাবতীকে শ্রীজগন্নাথের সেবায় নিযুক্ত করলেন।

সেই হতে পদ্মাবতী শ্রীজগন্নাথের সেবাদাসী।

একদিন শ্রীজগন্নাথ স্বপ্নে ব্রাহ্মণকে বললেন, ব্রাহ্মণ, আমি তোমার কন্যাকে দাসী ব'লে স্বীকার করেছি। কিন্তু আমার একটি কথা আছে। আমার এক সেবক আছে এখানে। তার নাম জয়দেব। পরম বিরক্ত সে। আমার ইচ্ছা, তোমার এই কন্যা তাকে দান কর।

জয়দেব আমার সেবক। পদ্মাবতী আমার সেবিকা। এদের মিলনে আমি সুখী হবো।

আদেশ পেয়ে ব্রাহ্মণ কন্যাকে নিয়ে জয়দেবের নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁকে শ্রীজগন্নাথের আজ্ঞা নিবেদন করলেন।

ঠাকুর, আপনি আমার এই কন্যা গ্রহণ করুন।

জয়দেব অবাক হ'য়ে গেলেন।

এমন আজ্ঞা প্রভু আমায় কি বিচারে করলেন? তাঁর অনেক সাজে। আমার সাজে না। এমন আজ্ঞা পালন করতে আমি অক্ষম। এ আমায় কৃপা নয়। অকৃপা। এ আমার বিড়ম্বনা।

ব্রাহ্মণ, আপনার কন্যা ফিরিয়ে নিন। এঁকে আমার প্রয়োজন নেই। যদি চান, শ্রীজগন্নাথের দেশ ছেড়ে আমি চলে যাই।

ব্রাহ্মণ বললেন, এ আমার অনুরোধ নয়। এ হ'ল স্বয়ং শ্রীজগন্নাথের আজ্ঞা। আপনি অবশ্যই শ্রীজগন্নাথের আজ্ঞা পালন করবেন।

জয়দেব বললেন, এমন অসম্ভব কথা আর বলবেন না।

জয়দেবে আর ব্রাহ্মণে এমনি ধারা যথেষ্ট বাক বিনিময় হ'ল।

ব্রাহ্মণ জয়দেবকে কিছুতেই রাজী করাতে পারলেন না।

অগত্যা কন্যাকে তিনি জয়দেবের কাছে রেখে বিদায় হ'লেন। যাবার আগে কন্যাকে বলে গেলেন।—

মা, ইনিই তোমার স্বামী। তুমি এখানে অপেক্ষা কর। ইনি অবশ্যই তোমাকে গ্রহণ করবেন। প্রভুর আদেশ মিথ্যা হ'তে পারে না।

পদ্মাবতী সেখানেই জয়দেবের কাছে ব'সে রইলেন।

জয়দেব অনুরোধ করলেন, তুমি স্থানান্তরে যাও। এখানে তোমার কোনও প্রয়োজন নেই।

পদ্মাবতী কেঁদে ফেললেন।

করুণা কর। বাবা আমায় তোমার কাছে সমর্পণ করেছেন। শ্রীজগন্নাথ আজ্ঞা করেছেন। অন্যথা এর হতেই পারে না। তুমিই আমার স্বামী। তুমি ত্যাগ করলেও আমি তোমাকে ছাড়ব না। যতদিন বাঁচি কায়ে মনে বাক্যে আমি তোমার সেবা ক'রে চলবো।

জয়দেব বিচার করলেন।—

প্রভুর ইচ্ছা অন্যরূপ হ'তে পারে না। বিবাহ আমাকে করতেই হবে। বুঝতে পারছি, মায়াদড়ি লাগলো গলায়।

শ্রীজগন্নাথ জগতের স্বামী, কর্তা। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

অচিরে বিবাহ হ'ল। জয়দেবের সঙ্গে পদ্মাবতীর।

জয়দেব সংসার পাতলেন। তিনি পদ্মাবতীর জন্যে এক ঝুপড়ি বাঁধলেন।

কিছুকাল পরে জয়দেব শ্রীরাধামাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন। নিযুক্ত করলেন পদ্মাবতীকে তাঁরই সেবায়।

জয়দেব আর পদ্মাবতী।
যথা দেবা তথা দেবী।

জয়দেব কবি। দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি গীতগোবিন্দ রচনায় নিযুক্ত।

গ্রন্থের একস্থানে তিনি খণ্ডিতা মধুব রস পরিবেশন করছেন।

শ্রীকৃষ্ণ রাধার পায়ে পড়ছেন, এ না হ'লে খণ্ডিতা রস থাকে না।

সংশয়ে আকুল হলেন জয়দেব।

আমি সুকুমার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এমন লাঞ্ছনা প্রকাশ করব!

অত্যন্ত দুঃখিত বেদনাহত হলেন তিনি।

বিষণ্ণ অন্তরে আর লিখতে পারলেন না। লেখা বন্ধ হ'ল।

গীতগোবিন্দ লেখা বুঝি আর সমাপ্ত হয় না!

রাধামাধব!—

বেরিয়ে এলো টানা দীর্ঘশ্বাস!

স্নানের সময় হ'ল। তিনি পুঁথিখানি বেঁধে যথাস্থানে রেখে দিলেন।

জয়দেব নদীতে স্নান করতে গেলেন। বাড়ী হ'তে সে জায়গা বেশ খানিকটা দূরে।

হঠাৎ ঘটে গেল এক অভাবনীয় ঘটনা।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জয়দেবের মূর্তি ধ'রে জয়দেবের কুটিরে উপস্থিত হলেন।

বিস্মিত পদ্মাবতী জিজ্ঞাসা করলেন, এইমাত্র স্নান করতে গেলে! কিন্তু এর মধ্যে ফিরে এলে কেমন ক'রে? আর, এলেই বা কেন? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে!

এক বার্তা মনে পড়ল পদ্মাবতী। পাছে ভুলে যাই তাই লিখে রাখতে এলাম।

এই ব'লে পুঁথিখানি নামিয়ে আনলেন। আনলেন দোয়াত কলম। যেখানে পৌঁছে জয়দেব আর লিখতে পারেন নি সেইখানটা বের করলেন।

জয়দেব লিখেছেন,—

স্মর-গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং……

কিন্তু তারপর?

তারপর আর লেখা হয় নি।

শ্রীকৃষ্ণ লিখলেন। তারপরেই লিখলেন—

দেহি পদপল্লবমুদারম্।

পদটা দাঁড়াল এই রকম—

স্মর-গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।

লেখা হ'য়ে গেল।

লেখা শেষে শ্রীকৃষ্ণ দ্রুত সেস্থান ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন।

পদ্মাবতীর সন্দেহের কি-ই বা আছে?

রাধামাধবোর্জয়তু।

রাধামাধবের জয় হোক। জয় হোক রাধামাধবের।

শ্রীকৃষ্ণ চ'লে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে জয়দেব এসে কুটিরে উপস্থিত হলেন।

চমকে উঠলেন পদ্মাবতী।

এইমাত্র তুমি পুঁথিখানিতে কি যেন লিখে চ'লে গেলে! এর

মধ্যেই স্নান শেষ ক'রে কিরূপে আসতে পারলে। আমার বড়ই সন্দেহ হচ্ছে। যেতে আধ ক্রোশ আসতে আধ-ক্রোশ। কি ক'রে সম্ভব? তুমি বল, যে লিখল সে কে? আর তুমিই বা কে? আমার মতিবিভ্রম হচ্ছে! কে আমার স্বামী?

চমকিত হলেন জয়দেব! বিস্মিতও হলেন!

দৌড়ে গিয়ে পুঁথি বের করলেন। দেখলেন লেখা রয়েছে—

দেহি পদপল্লবমুদারম্।

অপ্রাকৃত সদক্ষর!

বইখানি কখনও মাথায় রাখেন জয়দেব। কখনও বুকে।

দুই চোখ দিয়ে ফোয়ারার মতো জলধারা ছুটল। অসীম আনন্দে অবিরাম কণ্ঠ হ'তে বের হ'তে লাগল—দেহি পদ, দেহি পদ!

প্রেমে উন্মত্তের মতো হ'য়ে জয়দেব পদ্মাবতীর পায়ে পড়লেন।

তুমি ধন্য। তুমি ধন্য, পদ্মাবতী। তোমার জন্মতরু আজ ফলবতী হ'ল। জন্ম সার্থক তোমার। তুমি শ্রীকৃষ্ণের দেখা পেলে। হায়! মন্দভাগা আমি! তাঁর দেখা পেলাম না।

পদ্মাবতী, তোমার স্বামী তিনিই—যিনি তোমায় দর্শন দিয়েছেন।

এই হতেই

'গীতগোবিন্দের খ্যাতি সারা ত্রিভুবনে ব্যাপিল।'

এই গীতগোবিন্দ।

অপূর্ব গ্রন্থ! এর খ্যাতি সারা ভারতে। এখনও ত্রিসন্ধ্যা শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে গীতগোবিন্দ গান গেয়ে শোনানো হয়।

এর মহিমা অপার।

আপনি শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে এর মধ্যে এক পঙক্তি লিখেছেন। এমন সৌভাগ্য আর কোন গ্রন্থের? আর কোন লেখকের?

নীলাচলে অবস্থানকালে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে এই গ্রন্থ পাঠ ক'রে শোনানো হোতো। এই গ্রন্থ তাঁকে প্রভূত আনন্দ দান কোরতো।

শ্রীজগন্নাথী মাধব দাস

মাধব দাসের সবই ছিল। টাকা কড়ি ধন দৌলত ছিল। বাড়ীঘর ছিল। স্ত্রী ছিলেন। পুত্র কন্যাও ছিল।

কিন্তু তাঁর প্রিয়তম ছিলেন জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগে তিনি সব ছেড়ে দিয়ে একদিন পথে বেরিয়ে পড়লেন। কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ ভ্রাতা, কৃষ্ণ পুত্র। কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ জ্ঞান। কৃষ্ণই তাঁর জীবনের জীবন, জীবন-সর্বস্ব।

সাগরতীরে নীলগিরিতে তিনি ঘুরে ঘুরে বেড়ান। ভিক্ষা তিনি করেন না। যে যা দেন, তা-ই তাঁর অবলম্বন। তিনি অযাচক।

একবার তিনদিন যাবৎ কিছুই তাঁর জুটলো না। ফলে তিনদিন তিনি উপোসী রইলেন।

অন্তর-বিহারী জগন্নাথ তা টের পেলেন। পাঠিয়ে দিলেন সোনার থালায় নানারকম ভোগ মাধব দাসের কাছে।

মাধব দাস চোখ মেলে তাকালেন।

তিনি বুঝলেন, এ জগন্নাথেরই কাজ।

ভোগ খেয়ে তিনি থালাখানি বাইরে রেখে দিলেন।

মন্দিরের পূজারী পরদিন সকালে থালাখানি দেখতে পেলেন না। সোনার থালা। সকলে চারিদিকে খুঁজতে লাগলেন।

খুঁজতে খুঁজতে থালাখানি পাওয়া গেল মাধব দাসের কাছে।

পূজারী আর তাঁর লোকজন মাধব দাসকে চোর সাব্যস্ত করলেন। তাঁরা তাঁকে বেঁধে এনে মন্দিরের সামনে বেত মারতে লাগলেন।

সাধুর মুখে কথাটি নেই। নির্বিকার তিনি। বললেন না প্রকৃত কথা। শুধু বেতই খেলেন।

সেদিন রাত্রে জগন্নাথ স্বপ্নে পূজারীকে বললেন, মাধব দাসকে তোমরা যত মেরেছ, তা সবই লেগেছে আমার গায়ে। চেয়ে দেখ, আমার গায়ে। দেখ, আমার সারা অঙ্গ ফুলে রয়েছে। তোমরা মিছামিছি তাঁকে মেরেছ। ও থালা আমিই পাঠিয়েছিলাম।

পূজারী হায় হায় ক'রে উঠলেন। জগন্নাথের এত প্রিয় পাত্র ওই সাধু! তাঁকে এত অপমান, নির্যাতন করা হয়েছে!

পূজারী গিয়ে তাঁর কাছে বারংবার ক্ষমা চাইলেন। তাঁকে অশেষ সম্মান দেখালেন।

মাধব দাস তখনও নির্বিকার। তিনি নিন্দা, গ্লানি, অপমান আর সম্মানের বহু ঊর্দ্ধে। শুধু জগন্নাথের করুণা স্মরণ ক'রে তিনি অন্তরে পরম আনন্দ অনুভব করলেন।

সেই থেকে মাধব দাসের খ্যাতি খুব বেড়ে গেল। সকলে তাঁকে জগন্নাথী মাধব দাস ব'লে সম্মান দেখাতে লাগল।

এই মাধব দাস।

একবার মাধব দাসের দারুণ আমাশয় হ'ল। চলাফেরা করার শক্তিও তিনি হারালেন। তিনি বালুর উপরে প'ড়ে রইলেন। তাঁর জলের পাত্র আনার ক্ষমতাও রইল না।

খুব দুঃখ হ'ল জগন্নাথের। তিনি ছদ্মবেশে জলপাত্র থেকে মাধব দাসকে জল উঠিয়ে দিতে লাগলেন।

কে আপনি? কি জন্যে কাঙালকে এত দয়া করছেন?

আমি জগন্নাথ। তোমার দুঃখ দেখে হাত ধোওয়াতে এলাম।

কেন তুমি এমন অনুচিত কাজ করলে, জগন্নাথ? রত্ন সিংহাসনে তুমি ব'সে থাক। দেবতারা পর্যন্ত তোমার সেবা করেন। কত রাজা তোমার দরজায় ভৃত্যের মত দাঁড়িয়ে থাকেন! আমি নীচ, কাঙাল। আমাকে তুমি সেবা করতে এলে! লোকে শুনলে পরিহাস করবে যে! লক্ষ্মী ঠাকরুণ আমাকে লজ্জা দেবেন।

লজ্জা পাই পাব। তবুও তোমার দুঃখ আমি সইতে পারি নে।

কেন নিন্দা স্বীকার করবে? তার চাইতে আমার অসুখই না-হয় ভাল ক'রে দাও। তা হ'লে তো তোমার নিন্দা শুনতে হবে না।

তা পারিনে। নিয়মের ব্যতিক্রম করবার সাধ্য আমার নেই। তবে সেবা করতে তো বাধা নেই। লোকে জানুক, আমি মানুষকে কত ভালবাসি!

এই মাধব দাস।

একদিন শ্রীজগন্নাথ মাধব দাসকে বললেন, দেখ, সত্যবাদী গোপালের বাগানে বহু কাঁঠাল পেকে রয়েছে। চল, আমরা দুইজনে সেখানে গিয়ে কাঁঠাল খাই।

না, আমি যাবো না। তুমি যেতে চাও, যাও। আমি মানা কোরবো না।

মাধব দাস কিছুতেই যাবেন না। জগন্নাথও বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন।

অগত্যা মাধব দাস রাজী হলেন।

সেদিন রাত্রে চুপি চুপি দুইজনে উপস্থিত হলেন সত্যবাদী গোপালের কাঁঠাল বাগানে। সেখানে একটা বড় কাঁঠাল তাঁরা গাছ থেকে নামালেন। তারপরে দুইজনে সেই কাঁঠাল ভেঙ্গে মনের আনন্দে খেতে শুরু ক'রে দিলেন।

ঠিক এমনি সময়ে বাগানের মালিরা ছুটে এলো।

চোর, চোর!

জগন্নাথ ছুটে পালিয়ে গেলেন।

মাধব দাস সেখানে একা ব'সে রইলেন।

বাগানের মালিরা তাঁকে ধ'রে ফেললো। তারা কাঁঠাল সমেত মাধব দাসকে বেঁধে ধ'রে নিয়ে চললো।

আমি ভাই চোর নই। যে আসল চোর, চল, তাকে দেখিয়ে দেবো। তাকেই বাঁধবে চল। বড় চালাক সে। চালাকি ক'রে

আমাকে নিয়ে এসে শঠতা করে আমাকে বাঁধিয়ে সে পালিয়ে গিয়েছে। কাঁঠালের দাম তোমরা তার কাছ থেকেই নেবে চল। তাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। ওঃ! কী শঠ! আমাকে বাঁধিয়ে সে নিজে সাধু হ'ল!

কে সে চোর?

ঐ জগন্নাথ!—

জগন্নাথ! মালিদের ক্রোধ একেবারে সপ্তমে উঠলো।

নিজে চুরি ক'রে বলে কিনা জগন্নাথ চোর!

মার একে। খুব ক'রে মার। সবাই মাধব দাসকে প্রচণ্ডভাবে মারতে লাগলো।

যদি আমাকে বিশ্বাস না হয়, দেখবে, পালাতে গিয়ে তার পীতবসন কাঁটাবনে আটকে সেখানেই র'য়ে গিয়েছে। যদি সেখানে কাপড় পাও, তবে তো বুঝবে, সেই-ই চোর।

বেশ। সবাই মাধব দাসকে ধ'রে নিয়ে গেলো কাঁটাবনে।

কী আশ্চর্য! কাঁটাবনেই পাওয়া গেল পীতবসন।

মালিরা বিস্মিত হ'ল।

হে প্রভু জগন্নাথ! হে প্রভু জগন্নাথ?

চেঁচামেচিতে জেগে উঠলেন মন্দিরের পাণ্ডারা। তাঁরা সব কথা শুনলেন। মাধব দাসকে তাঁরা চেনেন। তাঁরা মহাসমাদরে মাধব দাসকে মন্দিরে নিয়ে এলেন। অশেষ সম্মান দেখাতে লাগলেন।

পরদিন জগন্নাথের মন্দিরে মহোৎসব হ'ল। রাশি রাশি কাঁঠাল চারদিক থেকে আসতে লাগলো ভোগ দেবার জন্যে।

জগন্নাথের কাঁঠাল খাবার বাসনা হয়েছে। আসবে না!

সেদিন সকলেরই মুখে এই কৌতুকের কাহিনী।

মাধব দাস জগন্নাথকে একান্তে পেয়ে বললেন—

'হাঁরে চোর ধৃষ্ট দুষ্ট শঠ লম্পটিয়া!
তুঞি চুরি করি আইলি মোরে বান্ধাইয়া॥

চোরা যে স্বভাব তোর আছে পূর্ব হৈতে।
ননী চোর বলি খ্যাতি আছয়ে জগতে ॥'

শুধু ননী চোর? আজ থেকে তোকে সবাই কাঁঠাল চোরও বলবে।

এই মাধব দাস।

এর কিছুকাল পরে মাধব দাসের বৃন্দাবনে যাবার বাসনা হ'ল।

তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করলেন।

জগন্নাথ মাধব দাসের সঙ্গ ছাড়তে চান না। তিনি সুকুমার বালকের বেশে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চললেন। মাধব দাস তা টের পেলেন না।

পথে একদিন তিনি তাঁর এক শিষ্যবাড়ী উপস্থিত হলেন। শিষ্যের স্ত্রী মাধব দাসকে মহা সমাদর ক'রে তাঁর খুব সেবা ও যত্ন করলেন। তিনি দেখতে পেলেন, গুরুদেবের সঙ্গে সঙ্গে সব সময় অপূর্ব সুন্দর এক বালক ঘোরাফেরা করেন। তিনি গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, গুরুদেব, আপনি এই বালকটিকে কোথা থেকে আনলেন? কার পুত্র এ? ভুবনভোলানো এমন মধুর রূপ তো আর কখনও দেখিনি।

মাধব দাস অবাক হ'য়ে গেলেন!

এ জগন্নাথেরই কাজ!

এই মাধব দাস।

মাধব দাস বৃন্দাবনে এসেছেন। উপস্থিত হলেন নিধুবনে।

নিধুবনে বঙ্কবিহারীর মন্দির। সুন্দর সেই মন্দির। আরও বেশী সুন্দর সেই মন্দির-দেবতা বঙ্কবিহারী।

হরিদাস বঙ্কবিহারীর সেবাইত। তিনি পরম ভক্ত।

বঙ্কবিহারীকে দেখে মাধব দাস মোহিত হলেন। হরিদাসের সেবা ও নিষ্ঠা তাঁকে পুলকিত কোরলো।

বঙ্কবিহারীর মন্দিরে কিছু সময় কাটিয়ে মাধব দাস চ'লে এলেন যমুনার তীরে।

সেদিন তাঁর কিছু মিললো না। মাধবদাস সেদিন উপোসী রইলেন।

পরদিন একটি সুকুমার বালক এসে মাধব দাসকে কিছু চানা-ভাজা দিয়ে গেল। মাধব দাস তাই দিয়েই বঙ্কবিহারীর ভোগ দিলেন। বঙ্কবিহারীকে তাঁর বড় ভাল লেগেছে।

ভোগ দেওয়া হ'লে মাধব দাস সেই চানা প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

এদিকে নিধুবনে ভোগ দেওয়া হচ্ছে। বঙ্কবিহারীর ভোগ। সেখানে ভোগের সময় মহা ধুমধাম। ভোগের সেখানে নানা উপকরণ। কত ব্যঞ্জন! কত প্রকার ভোগ!

ভোগ দেওয়া শেষ হ'ল।

হরিদাসের কেমন যেন সন্দেহ হ'ল।

আজ যেন বঙ্কবিহারী ভোগের কিছুই গ্রহণ করেন নি।

হরিদাস বিষণ্ণ হলেন। তিনিও সেদিন কিছুই গ্রহণ করলেন না।

রাত্রে হরিদাস স্বপ্নে সব জানতে পারলেন। বঙ্কবিহারী তাঁকে বলছেন, আজ আমার আদৌ ক্ষুধা নেই। যমুনার তীরে মাধব দাস রয়েছেন। তিনি আমাকে অপূর্ব চানা-ভাজা খাইয়েছেন। তা খেয়ে আমার পেট ভ'রে রয়েছে।

হরিদাস মুচকি হাসলেন।

তাঁর দুঃখ হ'ল। আনন্দও হ'ল।

দুঃখ হ'ল, বঙ্কবিহারী আজ তাঁর নিবেদিত ভোগ গ্রহণ করেন নি।

আনন্দ হ'ল, আজ তিনি একজন বড় মোহান্তকে দেখতে পাবেন। যিনি চানা খাইয়ে বঙ্কবিহারীকে সুখী করেছেন।

হরিদাস শিষ্যগণকে বললেন, ধীর সমীরে মাধব দাস নামে এক

সাধু রয়েছেন। তাঁকে ডেকে আন। তিনি চানা খাইয়ে বঙ্কবিহারীকে সুখী করেছেন।

শিষ্যগণ খুঁজে খুঁজে মাধবদাসকে বের করলেন।

চলুন। বঙ্কবিহারী আপনাকে ডাকছেন।

মাধব দাস বিনীতভাবে বঙ্কবিহারীর মন্দিরে এলেন।

হরিদাস সসম্মানে তাঁকে আবাহন করলেন। কিছু পরিহাসও করলেন। আপনি চানা খাইয়ে বঙ্কবিহারীর পেট ফুলিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে মিষ্টান্ন পক্বান্ন-এসব কিছুই খেতে দেননি। তাঁর অসুখ হয়েছে। উদগার উঠছে। ওই দেখুন, সব খাবার প'ড়ে রয়েছে। জানি না কত পিরীত ছিল আপনার চানাতে। তাইতো ওই চানা তাঁর কাছে অমৃত,হ'য়ে উঠেছিল। সেই লোভেই আমাদের ভোগের কিছুই বঙ্কবিহারী খান নি।

মাধব দাস অবাক।

তিনি একবার তাকান বঙ্কবিহারীর দিকে। একবার ফ্যালফ্যাল চোখে তাকান হরিদাসের দিকে।

সকালবেলার কথা তাঁর মনে হ'ল। নিজেকে তিনি বারংবার ধিক্কার দিতে লাগলেন।

আমি কী করেছি! যে মুখে ক্ষীর সর ননী বোচে না, সেই মুখে আমি কিনা চানা দিলাম!

দুই চোখ বেয়ে তাঁর জল গড়িয়ে পড়লো।

তিনি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লেন।

মূর্চ্ছা ভাঙ্গলে মাধব দাস দেখলেন, হরিদাস তাঁর দুই পায়ে লুটিয়ে রয়েছেন।

একী হ'ল! একী হ'ল! মাধবদাস আবার মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লেন।

বঙ্কবিহারী হাসছেন।

বড় মধুর সে হাসি।

শ্রীকৃষ্ণানন্দ ও শ্রীমাধবানন্দ

মহেশ্বর গৌড়াচার্য বাঙলা দেশের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র—কৃষ্ণানন্দ ও মাধবানন্দ।

কৃষ্ণানন্দ ছিলেন একজন অসাধারণ পণ্ডিত। তার উপাধি ছিল আগমবাগীশ। তাঁকে সকলে আগমবাগীশ ভট্টাচার্য বলে জানত। এখনও জানে।

কৃষ্ণানন্দ একজন বড় তান্ত্রিকও ছিলেন। আজকাল যে রূপে আর মূর্তিতে আমরা শ্রীশ্যামা পূজা করে থাকি, তার প্রথম কল্পনা করেন কৃষ্ণানন্দ।

সে এক মজার কাহিনী।

বর্তমানে কার্তিকী অমাবস্যায় এই শ্যামা পূজা হ'য়ে থাকে। এই শ্যাম মূর্তি আর পূজার পদ্ধতি এই আগমবাগীশের। এর আগে এ পূজার চলন ছিল না। তখন মূর্তির চলন না থাকায় পূজা হোতো ঘটে। পরে মূর্তি প্রকাশিত হলেও ঘটস্থাপন ব্যাপার এখনও পর্যন্ত চালু রয়েছে।

আগমবাগীশ ভট্টাচার্য ভগবতী শ্যামার মূর্তি তৈরী ক'রে পূজা করতে ইচ্ছা করলেন। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্র মতে ধ্যানের মন্ত্র অনুযায়ী বরাভয় কর কিরূপে তৈরী করতে হবে, আর দুই ভুরু বা কি রঙে রঞ্জিত করতে হবে তা' স্থির করতে না পেরে তিনি খুব চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। তাঁর আশঙ্কা হ'ল, হয়ত বা তাঁর ইচ্ছা সফল হবে না। তিনি বিমর্ষ হ'য়ে রইলেন।

তাঁকে বিমর্ষ ও চিন্তিত দেখে দেবী প্রসন্ন হ'য়ে প্রত্যাদেশ দিলেন।

কাল ভোরে ঘুম থেকে উঠে তুমি যে মূর্তি দেখবে, তাতেই আমার বরাভয় কর ও দুই ভুরুর রূপ জানতে পারবে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠতে একটু বিলম্ব হ'ল। বেশ কিছুক্ষণ আগেই সূর্যোদয় হয়েছে।

ঘুম থেকে উঠে যেমন বাড়ীর বের হয়েছেন, অমনি দেখলেন, ঘোর কালো রঙের একটি গোয়ালা ঘরের স্ত্রীলোক ডান পা এগিয়ে দিয়ে বাড়ীর দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতের গোবর-দলা হ'তে ডান হাতে গোবর নিয়ে দেয়ালে ঘুঁটে দেবার জন্যে গোবর ছুড়ে মারলেন। খুব পরিশ্রমের দরুণ তাঁর সারা মুখ হ'তে ঘাম বের হচ্ছিল। তাই দুই হাতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলায় কপালের সিন্দূরে দুই ভুরু লাল হ'য়ে গিয়েছে। সূর্যের আলোও পড়েছে তাঁর মুখে। এদিকে মাথার কাপড় প'ড়ে গিয়েছে। চুল আলুলায়িত। ঠিক এমনি সময়ে কৃষ্ণানন্দ তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাই মেয়ে লোকের স্বভাব-সুলভ লজ্জায় তিনি দাঁত দিয়ে জিভ কাটলেন।

এই মূর্তি দেখেই কৃষ্ণানন্দ বরাভয় কর প্রভৃতির বিষয় স্থির ক'রে নিলেন। সেই অবধি রাত্রিতে নিত্য ঐ প্রতিমা তৈরী ক'রে পূজার শেষে রাত্রিতেই বিসর্জন দিতেন।

আগমবাগীশের এই মূর্তি প্রকাশিত হবার পর হতেই এদেশে শ্যামা পূজা পদ্ধতি চালু হয়েছে।

এই কৃষ্ণানন্দ।

কৃষ্ণানন্দ শক্তি মন্ত্র গ্রহণ ক'রে তান্ত্রিক হ'য়ে ওঠেন আর নিত্য ভগবতী শ্যামার আরাধনা করতেন।

কনিষ্ঠ মাধবানন্দ উপাসনা করতেন নিজেদের কুলদেবতা গোপালের।

এঁদের বাড়ীতে এক সময়ে ভাল এক কাঁদি মর্তমান কলা ফলেছিল।

যথাসময়ে সেই কলা পাকার মত হ'ল। এমন সময়ে অপূর্ব এক ঘটনা ঘ'টে গেল।

কৃষ্ণানন্দের ইচ্ছা, ঐ কলা তিনি শ্যামা মাকে নিবেদন ক'রে দেবেন।

মাধবানন্দের ইচ্ছা, তিনি ঐ কলাগুলির সবই গোপালকে নিবেদন করবেন।

কলার কাঁদি নিয়ে কয়দিন যাবত রোজই দুই ভাই-এ কথা কাটাকাটি চলছে।

কৃষ্ণানন্দ বলেন, মাধব, বলে রাখছি, ঐ কলার একটিতেও তুই হাত দিবি নে। ঐ কলা দিয়ে আমি মায়ের ভোগ দেবো।

মাধবানন্দ জানান, দাদা, আমিও বলছি, তুমি ঐ কলার দিকে একটিবারও তাকিও না। ঐ কলা আমি আমার গোপালকে নিবেদন কোরবো।

রোজই এমনটি হয়। বাদ বিসম্বাদ লেগেই থাকে।

কৃষ্ণানন্দ বাড়ীর বের হবার সময় ব'লে যান, মাধব, দেখিস, কলা যেন তোর গোপালকে দিস নি।

মাধবানন্দ বলে যান, দাদা, কলা যেন তোমার মাকে খাইও না।

যত সময় বাড়ীতে থাকেন, দুই ভাই-এর লুব্ধ দৃষ্টি থাকে ঐ কলার কাঁদির উপর।

তবে লোভ নিজেদের জন্যে নয়। লোভ নিজ নিজ ইষ্ট দেবী আর ইষ্ট দেবের জন্যে।

ইতিমধ্যে সব কলাই বেশ পেকে উঠেছে। কলার কাঁদি কাটার ঠিক সময় এসে গিয়েছে।

সেদিন কৃষ্ণানন্দ কোনও কাজের জন্যে অন্য গ্রামে গিয়েছেন। ইচ্ছা রয়েছে, ঐ দিনই বাড়ী ফিরে এসে ইষ্ট দেবীকে কলা নিবেদন ক'রে দেবেন। যাবার সময় তিনি মাধবানন্দকে সতর্ক ক'রে যেতে ভুললেন না।

দাদার অনুপস্থিতির সুযোগ পেয়ে মাধবানন্দ কলাগুলি কেটে গোপালকে নিবেদন ক'রে দিলেন।

কৃষ্ণানন্দ বাড়ী এলেন। এসেই দেখেন গাছে কলা একটিও নেই। তিনি ক্রোধে উন্মত্তের মতো হলেন। নিশ্চয়ই এ মাধবের

কাজ। এখুনি তাকে সমুচিত শাস্তি দেবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মাধবকে খুঁজতে লাগলেন। চীৎকার ক'রে মাধবানন্দকে ডাকতে লাগলেন।

মাধবানন্দ ভয়ে লুকিয়ে রইলেন। সাহস করলেন না দাদার সম্মুখে উপস্থিত হ'তে। না জানি কি ঘটে।

কৃষ্ণানন্দ পেলেন না মাধবানন্দকে।

তাঁর মনে শান্তি নেই। তিনি খুঁজেই চলেছেন মাধবানন্দকে। হঠাৎ খেয়াল হ'ল, মাধব গোপালের মন্দিরে লুকিয়ে নেই তো।

কৃষ্ণানন্দ গোপালের মন্দিরে এলেন। দুয়ার ভিতর থেকে বন্ধ। নিশ্চয়ই তবে মাধব এই ঘরে লুকিয়ে রয়েছে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতে গেলেন মাধবকে।

কিন্তু ঘরের মধ্যে যা দেখলেন, তা দেখে কৃষ্ণানন্দ আনন্দে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লেন।

তিনি স্পষ্টই দেখলেন, তাঁরই ইষ্ট দেবী ভগবতী শ্যামা নিজের কোলে গোপালকে বসিয়ে একটি একটি ক'রে কলা গোপালকে খাওয়াচ্ছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেও দুই একটি কলা খাচ্ছেন। দুই জনেরই মুখে চোখে আনন্দ—শ্যামা মা-এর আর গোপালের।

মূর্চ্ছা ভাঙলে কৃষ্ণানন্দ চীৎকার ক'রে ডাকতে লাগলেন, মাধব, মাধব, ভাইটি আমার। ছুটে আয়, ছুটে আয় তুই ধন্য। তোর কৃপায় আজ যা দেখলাম তাতে আমার জন্ম সার্থক হ'ল। ভুলও চিরকালের জন্যে ভাঙ্গলো।

ছুটে এলেন মাধব। শুনলেন সব কথা। তিনি দাদার পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

দাদা, তোমার পূজা সার্থক। তোমার প্রাণের ঐকান্তিক অভিলাষ বুঝতে পেরেছেন তোমারই ইষ্টদেবী, জগজ্জননী, আমাদের শ্যামা মা। তোমার কৃপায় আজ আমারও ভুল ভাঙ্গলো। ভোগ, নিবেদনও সার্থক হ'ল। শ্যামা মা নিজে আমার গোপালকে

খাইয়ে দিলেন। আর, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করবার জন্যে নিজেও তোমার ভোগ গ্রহণ করলেন।

দুই ভাই একত্রে প্রণত হলেন মন্দির দুয়ারে।

গৃহ তীর্থে পরিণত হ'ল।

কৃষ্ণানন্দ নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক লোক ছিলেন।

তিনি তন্ত্রসার নামে বিরাট একখানি গ্রন্থ সংকলন করেন। এই গ্রন্থে তিনি শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় মতাবলম্বীদের দেব ও দেবীর উপাসনা ও পূজাপদ্ধতি অতি সুন্দর ক'রে প্রকাশ করেছেন। বিশেষ ক'রে তন্ত্রমতে সাত্বিক পূজা কি ভাবে করতে হয় তা' তিনি দেখিয়েছেন। কলির বেদ এই তন্ত্রশাস্ত্রে শাক্ত বৈষ্ণবে ভেদ বুদ্ধির নিন্দা করা হয়েছে।

কবীর

কবীর জোলার ছেলে।

তিনি আজন্ম তপস্বী।

কাশীতে রামানন্দ স্বামীর খুবই খ্যাতি। তিনি একজন বড় সাধক। মহাপুরুষ।

রোজ ভোরে উঠে রামানন্দ স্বামী মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করেন।

কবীরের বড় সাধ, তিনি রামানন্দ স্বামীর কাছে দীক্ষা নেন। কিন্তু সে হবে কেমন ক'রে?

সে যে জোলার ছেলে। তাকে কি রামানন্দ স্বামী কৃপা করবেন? তাঁর কি এত ভাগ্য হবে?

একদিন রাত্রি থাকতে কবীর গিয়ে ঘাটের নীচে শুয়ে রইলেন।

রামানন্দ স্বামী এলেন স্নান করতে। অজ্ঞাতে তাঁর পা লাগল গিয়ে কবীরের গায়ে।

তটস্থ হ'য়ে রামানন্দ স্বামী ব'লে উঠলেন, রাম কহ।

কবীরের কানে সেই রাম নাম প্রবেশ করল।

কবীর রাম নাম মহামন্ত্র লাভ করলেন। লাভ করলেন ঠিক এমনি ভাবে। সাধক শ্রেষ্ঠ রামানন্দ স্বামীর কাছ থেকে।

সেই থেকে তিনি রোজ রাম নাম জপ করেন।

মা, বাবা সকলে তাকে তিরস্কার করেন। সকলে বলেন, তুই শেষে হিন্দু হ'য়ে গেলি, কবীর! তোকে এমন কাজ করতে কে শেখাল?

গুরু আমার শ্রীরামানন্দ স্বামী। তিনি আমাকে কৃপা ক'রে দীক্ষা দিয়েছেন। আমি তাঁর দাসানুদাস।

একদিন দারুণ রেগে কবীরের মা রামানন্দ স্বামীর কাছে উপস্থিত হলেন।

তুমি আমার ছেলেকে শিষ্য ক'রে তার জাতি নষ্ট করলে কেন? আর কে-ই বা তোমাকে অনুমতি দিয়েছে?

রামানন্দ স্বামী মৃদু হাসলেন।

আমি তাকে কবে, কোথায় শিষ্য করেছি, তা-তো স্মরণ করতে পারছি নে, মা

কবীর এসে প্রণাম করলেন।

তোমাকে আমি কবে শিষ্য করলাম, বৎস?

প্রভু, বহুদিন হ'ল কৃপা ক'রে আমায় মন্ত্র দিয়েছ। ভাগ্যবান আমি।

জানালেন সব বৃত্তান্ত।

হ্যাঁ, এইবার স্মরণ হ'ল স্বামীজীর।

কবীরের উপর রামানন্দ স্বামীর মহাপ্রীতি জন্মাল। প্রেমাবিষ্ট হ'য়ে পড়লেন তিনি। আলিঙ্গন করলেন কবীরকে।

তুমি বিপ্র হ'তেও শ্রেষ্ঠ, কবীর।

কবীর একমনে রাম নাম জপ করেন।

রাম রাম! রাম রাম রাম।

এদিকে দিন আর চলে না। সংসারে ঘোর অনটন। মা রোজ কবীরকে তিরস্কার করেন।

বাধ্য হ'য়ে কবীর তাঁত চালান।

তাঁতের নলি চলে। আর কবীরের কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে –

জয় শ্রীরাঘব রাম, জয় সীতারাম।
রাম রাম। জয় রাম রাম রাম॥

একদিন একখানি কাপড় বুনে হাটের কিনারে গিয়ে কবীর দীনভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এক সাধু এলেন। চাইলেন কাপড়খানি।

কৃতার্থ হলেন কবীর। বিনামূল্যে কাপড়খানি দিয়ে দূর থেকে তাঁকে প্রণাম করলেন। এলেন শূন্য হাতে ঘরে ফিরে।

প্রায়ই এমন হয়।

মা তাঁকে ভর্ৎসনা করেন। কবীর তখন রাম নাম জপ করেন।

জয় শ্রীরাঘব রাম, জয় সীতারাম।
রাম রাম। জয় রাম রাম রাম ॥

একদিন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কৃপা করলেন কবীরকে। তিনি কবীরের রূপ ধ'রে কবীরের কুটিরে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন প্রচুর দ্রব্য-সম্ভার।

মা ভয় পেলেন।

এত সব জিনিষপত্র কোথায় পেলি? তুই কি ডাকাতি ক'রে এই সব এনেছিস, কবীর?

ঠিক এই মুহূর্তে কবীর কুটিরে ফিরে এলেন।

তার আগেই শ্রীরামচন্দ্র সতর্কিতে অন্তর্ধান করেছেন।

চিন্তিত হলেন কবীর।

নিশ্চয়-ই এ কাজ আমার প্রভুর। প্রভু, এই দীন কাঙালের দারিদ্র্য দূর করতে তুমি নিজে এসেছো এই সব দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে। কাঙালের প্রতি তোমার এত করুণা! হায় প্রভু, হায়! তা' হয় না। দারিদ্র্যই যে এ কাঙালের একমাত্র সম্বল। এই সম্বল আছে ব'লেই তো তুমি এসেছো, প্রভু! দুঃখের ঠাকুর, দারিদ্র্যের ঠাকুর, দুঃখ কষ্টই থাক আমার নিত্যকার সঙ্গী হ'য়ে। তা' নইলে যে তোমাকে পাবো না, প্রভু!

কবীর সবই বিলিয়ে দিলেন।

অলৌকিক এই ব্যাপার নিমেষে চারিদিকে প্রচারিত হ'যে পড়ল।

একদল ব্রাহ্মণ এই কথা শুনলেন। তাঁদের মনে দারুণ হিংসা হ'ল।

হ্যাঁরে জোলার ছেলে, এত রাশি রাশি দ্রব্য সামগ্রী তুই যাকে তাকে বিলিয়ে দিলি! আমরা হলাম সৎ ব্রাহ্মণ। কৈ, আমাদের তো কিছুই দিলি নে! আমাদের যদি কিছুই না দিবি, ফল ভালো হবে না।

ঘরে তো আর কিছুই নেই। ভবিষ্যতে যদি কখনও কিছু জোটে, অবশ্যই আপনাদের দেবো।

একদিন আবার বহু জিনিস এলো।

এ-সবই কবীর পাঠিয়েছেন। ছল ক'রে ভারীরা জানাল।

কবীর বাড়ী এলেন। দেখলেন জিনিসপত্র। তিনি মহাভাবনায় পড়লেন।

প্রভু, তুমি আমাকে আবার পরীক্ষা করছ! আমি তো বলেছি, প্রভু, আমি ঐশ্বর্য চাইনে, প্রাচুর্য চাইনে। অভাব অনটন, দুঃখ দারিদ্র্যই আমি চাই। এ-সবের দৌলতেই যে তোমাকে পাবো, প্রভু। না প্রভু, না! আমাকে আর এভাবে প্রলুব্ধ কোরো না।

কিছুক্ষণ বাদে কবীরের খেয়াল হ'ল। ও, সেদিন ব্রাহ্মণেরা এই অকিঞ্চনের কাছে কিছু যাচ্ঞা করেছিলেন। এ হতভাগ্য ব্যর্থ হয়েছিল সেদিন ব্রাহ্মণদেব সেবা করতে। আজ এই অভাজন যাতে সেবার সে সুযোগ পায় তারই জন্যে এত সব জিনিস তুমি পাঠিয়েছো! তুমি দেখাতে চাও, কাঙালের প্রতি তোমার কত করুণা! তাই হোক করুণাময়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। এই সব সামগ্রী ব্রাহ্মণদেব সেবাতেই লাগুক।

সেদিন অশ্রু-সজল চোখে সেই সব ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ ক'রে এলেন। তাঁরা এলে সব জিনিসই পরম শ্রদ্ধাভরে তাঁদের দান ক'রে কবীর নিশ্চিন্ত হলেন

এতেও ব্রাহ্মণদের হিংসা কমল না। রাগ পড়ল না।

একদিন কবীরকে অপদস্থ করবার জন্যে তাঁরা এক ষড়যন্ত্র করলেন। গ্রামে গ্রামে গিয়ে বহু ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ ক'রে এলেন।

কবীর আজ ব্রাহ্মণ ভোজন করাবেন। আপনাদের নিমন্ত্রণ সেখানে।

কবীরের কুটিরে সেদিন হাজার ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণে এসেছেন।

কবীর বুঝলেন সবই। তিনি বিলক্ষণ জানেন, যশ ও অপযশ,

মান ও অপমান, এ-সবেরই মালিক প্রভু শ্রীরামচন্দ্র। যদি তাঁর ইচ্ছা হয়, হোক কবীরের অপমান, দুখ কি তাতে? সে ও তো দয়াল প্রভুরই দান। তিনি সকল দানের দাতা প্রভু শ্রীরামচন্দ্রেরই নাম জপ করতে লাগলেন।

জয় শ্রীরাঘব রাম জয় সীতারাম।
রাম রাম, জয় রাম রাম রাম ॥

চক্রান্তকারী সেই ব্রাহ্মণদের সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্যে আর ভক্তের মান রক্ষার জন্যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ভারে ভারে সম্ভার পাঠিয়ে দিলেন সেদিন কবীরের কুটিরে।

কবীরের মান রক্ষা হল। খ্যাতি বাড়লো। জনসাধারণ বুঝলেন, যাঁরা ষড়যন্ত্র করেছিলেন সেই ব্রাহ্মণরাও বুঝলেন, কবীর একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ। অনেকেই বুঝলেন, ভগবান সত্যই ভক্তবৎসল।

কবীর দিনরাত রাম নাম জপ করেন। আর কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর।

একদিন এক কুলটা এসে কবীরের হাত ধরল। কবীরের সেদিকে খেয়াল নেই। অবিরাম রাম নাম গেয়েই চলেছেন।

কুলটা কবীরের হাত ধ'রে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে লাগল।

অপ্রত্যাশিত এই ব্যাপার দেখে বহুলোক অবাক হ'য়ে গেলেন। অনেকে দুখ পেলেন। কয়েক জনের সন্দেহও হ'ল। কবীর কি অবশেষে নষ্টচরিত্র হ'য়ে পড়লেন।

কবীর নির্বিকার।

একদিন সেই কুলটা কবীরের হাত ধ'রে একেবারে রাজসভায় উপস্থিত। কবীরের বাঁ হাতে করোয়া।

এ দৃশ্য দেখে রাজা কিছুটা সন্দিগ্ধ হ'য়ে পড়লেন। তিনি কবীরকে পূর্বের মত ভক্তি শ্রদ্ধা দেখালেন না। অভিবাদন করলেন না। আসন দিলেন না বসতে।

শ্রীরামচরণকমলে-সমর্পিত প্রাণ কবীর তখনও নির্বিকার। রাজা

না-ই বা দিলেন বসতে আসন, না-ই বা করলেন অভিবাদন, কি আসে যায় তাঁর ? যে মন নিয়ে গিয়েছিলেন রাজসভায় ঠিক সেই মন নিয়েই রাজসভা থেকে ফিরে আসছেন। হঠাৎ তিনি তটস্থ হ'য়ে পড়লেন। চারিদিকে কবোয়ার জল ঢালতে লাগলেন।

রাজা ভীত হ'য়ে পড়লেন।

আপনি কি আমার কোনও অনিষ্ট করলেন ?

না মহারাজ। আপনার অনিষ্ট কোরবো কেন ?

তবে জল ঢাললেন কেন ?

পুরীধামে শ্রীমন্দিরে হঠাৎ আগুন লেগে গিয়েছে, মহারাজ। সে আগুনে পুড়ে যাচ্ছিল সেবকের পা। সেই আগুন নিভোবার জন্যেই জল ঢালছিলাম। আপনার শঙ্কার কোনও কারণ নেই।

রাজা বিস্মিত হলেন। বলেন কি কবীর !

ব্যাপার সত্য কি না পরখ ক'রে দেখবার জন্যে সেই দিনই বার তিথি সময় সব লিখে পুরীধামে বার্তা পাঠালেন তিনি।

সংবাদ এলো যথা সময়ে

হ্যাঁ, সত্যই শ্রীমন্দিরে আগুন লেগেছিল। সে আগুন জল ঢেলে ঢেলেই নিভে যায়।

রাজার মনে ভয় হ'ল। এ হেন ক্ষমতাপন্ন সিদ্ধ মহাপুরুষকে ভ্রষ্ট ব'লে অপমান করেছেন !

তিনি কবীরের কাছে বারংবার ক্ষমা চাইলেন।

তুমি রাজা। আমাকে তুমি এত স্তুতি কোরো না। আমার কাছে তোমার কোনও অপরাধ নেই। তুমি কোনও অপরাধ করনি। তুমি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সেবা কর।

জয় শ্রীরাঘব রাম, জয় সীতারাম !
রাম রাম, জয় রাম রাম রাম ॥

একদিন একদল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গিয়ে বাদশাহের দরবারে অভিযোগ করলেন।

কবীর নামে একজন মুসলমান সব সময়ে হিন্দুয়ানি ক'রে

বেড়াচ্ছে। বহু স্ত্রীলোককে ঘর থেকে বের ক'রে হাত ধ'রে ধ'রে সে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। কোথা থেকে সে টাকা কড়ি পায় জানিনে। আপনি এর বিচার করুন।

বাদশাহ কবীরকে তলব করলেন।

কবীর এলেন। দাঁড়ালেন বাদশাহের সম্মুখে।

কাজী বললেন, তোমার সম্মুখে বাদশাহ। তাঁকে সেলাম কর, কবীর।

কবীর শান্তভাবে বললেন, আমার একমাত্র প্রভু শ্রীরামচন্দ্র। তিনি সর্বক্ষণই আমার সম্মুখে রয়েছেন। তাঁকেই আমি সেলাম করি। আর সেলাম করি তাঁর অগণিত ভক্তজনকে।

কাজী আদেশ করলেন, বাদশাহকে সেলাম কর।

কবীর সেই রকমই শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে বললেন, ইনি সেলামের যোগ্য নন।

বাদশাহ মনে করলেন, এই নগন্য লোকটি সকলের সামনে তাঁকে অপমান করল। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে আদেশ করলেন, হাত পা বেঁধে একে নদীর জলে ফেলে দাও। মৃত্যু হোক এর এমনি করেই।

বাদশাহের কয়েকজন অনুচর কবীরের হাতে পায়ে শিকল বেঁধে নিক্ষেপ করল নদীতে।

আশ্চর্য! কবীর নদীতে ভেসে রইলেন। কোনও অনিষ্ট হ'ল না তাঁর। সকলে অবাক হ'য়ে গেলেন অদ্ভুত এই দৃশ্য দেখে। আরও অবাক হলেন সকলে যখন তাঁরা দেখলেন কবীর তীরে এসে রাম নাম জপ করছেন।

তবে নিক্ষেপ কর একে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। বাদশাহ গর্জন ক'রে উঠলেন।

কবীরকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হ'ল।

পরম আশ্চর্য! এতেও কোনও অনিষ্ট হ'ল না কবীরের। পরম শান্তভাবে রাম নাম জপ করতে লাগলেন তিনি।

মেরে ফেল গুলি ক'রে। বাদশাহ রেগে যেন ফেটে পড়লেন।

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে সবাই দেখল কবীর সম্পূর্ণ অক্ষতই রয়েছেন। শান্ত সমাহিত পুরুষ রাম নাম জপ করেই চলেছেন।

এতক্ষণে বাদশাহ ভীত হ'য়ে পড়েছেন। কাকে এত নির্যাতন করলাম! ইনি যে একজন অলৌকিক শক্তিধর মহাপুরুষ! নতজানু হ'য়ে ক্ষমা চাইলেন বাদশাহ।

আমি অপরাধী। আমাকে ক্ষমা করুন।

দিন যায়।

কবীরের কণ্ঠে শুধু রাম নাম। দিন রাত্রি কখন এসে কখন মিলিয়ে যায়! দুমুঠো অন্ন মুখে তোলা—না-ই বা হ'ল দিনের পর দিন। সংসারের কাজকর্ম—সে তো বহু আগেই চুকে গিয়েছে। এখন শুধু অবিরাম রাম নাম। রাম রাম। রাম রাম।

প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের আসন আগেই নড়েছিল। এবার একেবারে টলমল ক'রে উঠল। ভক্তের প্রবলতম আকর্ষণে ভক্তবৎসল রইতে পারলেন না স্থির হ'য়ে। চ'লে এলেন। এলেন কবীরের কুটিরে। জীর্ণ কুটিরে প্রেমের ঠাকুর এলেন ছদ্মবেশে নয়, স্বরূপে। দাঁড়ালেন কবীরের সম্মুখে।

কৃতার্থ রোমাঞ্চিতকায় কবীর দেখলেন, সম্মুখে তাঁর নয়নানন্দনন্দন শ্রীরামচন্দ্র। সারা জনম যাঁকে ডেকে ডেকে চলেছেন সেই নব দূর্বাদল-শ্যাম রাজীবলোচন। সর্ব অঙ্গে তাঁর দিব্য লাবণ্যের ছটা। শিরে স্বর্ণমুকুট, আজানুলম্বিত হস্তে ধনুর্বান। মুখে তাঁর মৃদু মধুর হাসি। কমলনয়নেও হাসির ঝলক। সে হাসির ঝলকে স্বর্গের জ্যোতি বিচ্ছুরিত।

অমৃত জ্যোতির ঢেউ খেলে যায় দশদিকে। তাতে ডুবে যেতে চায় কবীরের অন্তরাত্মা, সমস্ত সত্তা।

মধুর রূপ, মধুর প্রেম মধুর করুণা তার সঙ্গে মধুর ভক্তি, নিষ্ঠা ও তপস্যার মধুর ফল সব মিশে একাকার হ'য়ে গেল। অশ্রুর বন্যা নিরুদ্ধ ক'রে ফেলল প্রাণের আবেগ। ভাসিয়ে দিল মৃত্তিকা।

বাক্যহারা কবীর নয়নাভিরাম লাবণ্য-মনোরম সেই রাজীব-লোচনের সম্মুখে জ্ঞানহারা হ'য়ে লুটিয়ে পড়লেন।

দিন যায়। দেখতে দেখতে এসে গেল জীবনের শেষ যাম। অসংখ্য অনুরাগী ও ভক্তের আকুল আহ্বানে কবীর পাটনায় এসেছেন।

হঠাৎ এক সময়ে এসে পড়ল অন্তিম মুহূর্ত।

তিনি প্রস্তুতই ছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন আগে থাকতেই। এসে গিয়েছে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর চির মিলনের লগ্ন।

তিনি একখানি সাদা কাপড় আনালেন। সেই সাদা কাপড়ে সারা দেহ ঢেকে রইলেন শুয়ে।

সেই তাঁর শেষ শয্যা।

সেই অবস্থাতেই রাম নামের সঙ্গে ভক্ত-শ্রেষ্ঠ কবীরের দেহের প্রাকারটি টুটে গেল। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের নিত্যধামে ঘটল তাঁর উত্তরণ। চির মিলনের বেদীতে গিয়ে তিনি আসন পাতলেন।

রাম রাম। রাম রাম। রাম রাম।

সাশ্রুনয়নে দলে দলে হিন্দু এলেন। এলেন দলে দলে মুসলমান।

মরদেহটি নিয়ে বাধল কলহ।

হিন্দুরা বললেন, এ দেহের সৎকার কোরবো।

মুসলমানেরা বললেন, এ দেহ কবর দেবো।

একজন মৃদু হাসছিলেন। তিনি বললেন. ঝগড়া ক'রে কি লাভ? আগে দেখই না শব কোথায়?

অতি সন্তর্পণে কাপড়খানি ওঠানো হ'ল।

কোথায় শব! শব নেই! সেখানে রয়েছে কিছু ফুল আর কয়েকটি তুলসী পাতা।

হিন্দুরা তুলসী পাতা কয়টি নিয়ে সমাধি নির্মাণ করলেন।

মুসলমানেরা ফুলগুলি নিয়ে কবর দিলেন।

জয় শ্রীরাঘব রাম, জয় সীতারাম।

রাম রাম। জয় রাম রাম রাম॥

দেবী ভবতারিণী ও শ্রীরামকৃষ্ণ

হুগলী জেলার অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রাম।

এই কামারপুকুরে এক শুভদিনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ভুবনসুন্দর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যজীবনে নাম ছিল গদাধর।

গদাধর চট্টোপাধ্যায়। গদাধর ক্ষুদিরামের পুত্র।

ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। চন্দ্রমণি তাঁর স্ত্রীর নাম। রঘুবীর এঁদের উপাস্য দেবতা।

একদিন ক্ষুদিরাম গিয়েছেন ভিন্ন গ্রামে কোনও এক কাজের জন্যে।

দুপুর হয়েছে। ফিরবার সময় রোদের তাতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বিশ্রাম নিলেন মাঠের পাশে এক গাছতলায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তন্দ্রা এলো। এমন সময়ে ক্ষুদিরাম এক স্বপ্ন দেখলেন।

নবদূর্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র বালকের বেশে আবির্ভূত হলেন তাঁর সুমুখে। মুখখানি তাঁর যেন কিছুটা ম্লান।

অঙ্গুলি সংকেতে একটি স্থান দেখিয়ে তিনি বললেন, বড় অযত্নে আছি আমি এখানে, ক্ষুদিরাম। বেশ কিছুদিন যাবৎ রয়েছি অনাহারে। তুমি আমায় নিয়ে চল। নিয়ে চল তোমার কুটিরে। বড় সাধ হয়েছে তোমার সেবা পেতে।

বিহ্বল হ'য়ে পড়লেন ক্ষুদিরাম।

প্রভু, আমি বড়ই গরীব। কি ক'রে তোমার সেবা চালাবো? তুমি যে রাজরাজেশ্বর।

ভয় নেই। তোমার ভক্তি আছে। নিষ্ঠা আছে। যার এই দুই আছে তার সবই আছে। দ্বিধা কোরো না। আমি তোমার ত্রুটি কখনও গ্রহণ কোরবো না। আমায় তুমি নিয়ে চল।

ভগবানের এই অযাচিত করুণায় ক্ষুদিরাম আত্মসংবরণ করতে

পারলেন না। প্রাণের আবেগে কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতেই তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। তাকাতে লাগলেন এদিকে ওদিকে।

হ্যাঁ, ঐ-তো স্বপ্ন-নির্দিষ্ট ধানের ক্ষেত।

এগিয়ে গেলেন সেখানে। দেখলেন, সেখানে রয়েছে একখানা পাথর। অর্ধেক তার মাটির নীচে পোঁতা। আর, তার উপরে এক বিষধর সাপ ফণা বিস্তার ক'রে রয়েছে।

আর একটু এগুতেই সাপ ধীরে ধীরে চ'লে গেল। ক্ষুদিরাম দেখলেন এ সামান্য পাথর নয়। এ-যে শালগ্রাম শিলা। লক্ষণ দেখে বুঝলেন, এ রঘুবীর শিলা। তাঁরই ইষ্টদেব।

জয় রঘুবীর!

ক্ষুদিরাম নিয়ে এলেন স্বয়মাগত রঘুবীরকে নিজের কুটিরে। পরম যত্নে সেবা করতে লাগলেন ঠাকুরের।

একবার গয়াধামে গিয়েছেন ক্ষুদিরাম তীর্থ করতে।

একদিন সেখানে দেখলেন এক স্বপ্ন। জ্যোতির্ময় মূর্তিতে ভগবান গদাধর রত্নসিংহাসনে ব'সে আছেন। মুখে তাঁর মৃদুমন্দ হাসি। তিনি বললেন, ক্ষুদিরাম, অচিরে তোমার গৃহে তোমারই পুত্ররূপে আমি আবির্ভূত হবো। এই কথা ব'লে ঠাকুর অন্তর্হিত হলেন।

ক্ষুদিরাম কামারপুকুরে ফিরে এলেন।

একদিন কথায় কথায় জানালেন সহধর্মিণী চন্দ্রমণিকে এই স্বপ্নের বৃত্তান্ত।

চন্দ্রমণি বললেন, হ্যাঁ, আমিও এই ধরণের স্বপ্ন দেখেছি।

কিছুকাল পরে এঁদের একটি পুত্র হ'ল। সর্বাঙ্গসুন্দর ভুবনমোহন পুত্র।

ক্ষুদিরাম পুত্রের নাম রাখলেন গদাধর।

কামারপুকুরে গদাধরের বাল্যজীবন কাটে পরম আনন্দে। মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গের মতোই স্বচ্ছন্দ বিহার তার। তবে একটা দিকে অনুরাগ প্রবলতর। ধর্মযাত্রা বা শিবের গান শুনলেই বালক গদাধর পরম

উৎসাহে সেখানে ছুটে যায়। শোনে তন্ময় হ'য়ে। দেখে নির্নিমেষে। একদিন গ্রামে যাত্রাগান হচ্ছে। গদাধর সেদিন সেজেছে শিব। জটা বাঘছাল হাড়ের মালা প'রে গদাধরের ভাবান্তর হ'ল। শিবের সাজসজ্জা বালককে নিয়ে গেল আর এক জগতে। গদাধর সম্বিৎ হারালো।

মাঝে মাঝে এমনি ধারাই হয়। এমনিভাবেই দিন কাটে।

অল্পবয়সেই পিতৃবিয়োগ ঘটেছে। গদাধরের কোনও পরিবর্তন হ'ল না! পাঠশালায় পড়তে আগ্রহ নেই।—চাল কলা বাঁধার পড়ায় কি লাভ! আমি পড়তে চাইনে। বলে গদাধর।

চৌদ্দ বছরে পা দিতে দিতেই বালকের ভক্তি আর ভাবুকতা এত বেশী বেড়ে গেল যে পাঠশালার অর্থকরী শিক্ষা তার কাছে নেহাতই অপ্রয়োজনীয় ব'লে মনে হ'তে লাগল। তার মনে হ'তে লাগল, তার জীবন যেন অন্য কাজের জন্যে নির্দিষ্ট হয়েছে। ধর্ম সাক্ষাৎকার করতে তাকে তার সব শক্তি নিয়োজিত করতে হবে।

গদাধরের বড় ভাই রামকুমার।

তিনি থাকেন কলকাতায়। ভাবলেন গদাধরকে নিয়ে যাই কলকাতায়। যদি সেখানে ওর কিছু স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে।

একটু পিছন ফিরে তাকাই।

কলকাতার জানবাজারের জমিদার রাজচন্দ্র সেন তাঁর স্ত্রী রাসমণি। উত্তরকালে যিনি রাণী রাসমণি নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

রাণীর অন্যতম জামাতা হলেন মথুরামোহন বিশ্বাস। লোকে তাঁকে সেজ বাবু বলেই জানত।

রাণী কাশী যাবেন মনস্থ করছেন। দর্শন করবেন অন্নপূর্ণা আর বিশ্বনাথকে।

প্রচুর অর্থ আর শ খানেক নৌকো নিয়ে তিনি রওনা হলেন। উত্তরে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত এসেছেন। এমন সময়ে একরাত্রে স্বপ্ন দেখলেন রাণী।

তিনি দেখলেন, দেবী ভবতারিণী তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁকে বললেন তিনি, ওরে, তোর কাশী যাবার আর দরকার নেই। এই ভাগীরথী তীরেই আমাকে প্রতিষ্ঠা কর। আমাকে অন্নভোগ দে।

রাণীর আর কাশী যাওয়া হ'ল না।

ভাগীরথীর পূর্ব উপকূলে দক্ষিণেশ্বর। এখানে ঘাট বিঘে জমি কিনলেন। নয় লাখ টাকা খরচ ক'রে মন্দির আর মূর্তি তৈরী করলেন।

বিরাট এই মন্দির তৈরী করতে সময় লাগল দশ বছর।

এই দশ বছর রাণী ব্রতধারিণী হ'য়ে ছিলেন। ছিলেন কঠোর নিয়মে সংযমে। ত্রি-সন্ধ্যা স্নান করেছেন। হবিষ্যান্ন খেয়েছেন। শুয়েছেন কঠিন মেঝেতে।

মূর্তি তৈরী হ'লেও বহু দিন ছিল এই মূর্তি বাক্সবন্দী হ'য়ে। এক দিন সবাই দেখতে পেলেন মূর্তি ঘামছে।

স্বপ্ন দেখলেন রাণী।

দেবী ভবতারিণী তাঁকে বলছেন, আমাকে আর কতদিন কষ্ট দিবি এমনি বন্ধ ক'রে রেখে? আমায় মুক্তি দে।

অধীর হ য়ে পড়লেন রাণী।

অচিরেই প্রতিষ্ঠাব আয়োজন করলেন।

রূপার সহস্রদল পদ্ম। তার উপর দক্ষিণ শিয়রে শবরূপে শিব শুয়ে আছেন। তাঁরই বুকে পা রেখে দাড়িয়েছেন দেবী ভবতারিণী।

দেবী চতুর্ভুজা। দুই বামকরে নবমুণ্ড আর অসি। আর দুই দক্ষিণ করে বর ও অভয় মুদ্রা। দেবী দক্ষিণাস্যা।

মা অন্ন ভোগ চেয়েছেন। শূদ্রানীর অধিকার নেই দেবতাকে ভোগ দিতে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা বললেন, কৈবর্তের মেয়ে দেবীকে অন্নভোগ দেবার অধিকারী নন।

ভেঙ্গে পড়লেন রাণী। এত ক'রেও মাকে অন্নভোগ নিবেদন করতে পারবো না!

কামারপুকুরের রামকুমার বিধান দিলেন, অবশ্যই পারা যাবে।

প্রতিষ্ঠার আগে রাণী যদি দক্ষিণেশ্বরের যাবতীয় সম্পত্তি কোনও ব্রাহ্মণকে দান করেন তবে দেবীকে অন্নভোগ নিশ্চয়ই দেওয়া যাবে।

কুল পেলেন রাণী। তিনি ঠিক করলেন, তাঁর গুরুদেবের নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন।

সবই হ'ল।

কিন্তু কেউ ই পূজারী হ'তে চান না। কৈবর্তের মেয়ে যে মন্দির গড়েছেন তার পূজারী হ'তে তাঁরা রাজী নন।

রাণী ধরলেন রামকুমারকে।

অগত্যা রামকুমার রাজী হলেন পূজারী হ'তে।

১২৬২ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ স্নানযাত্রার দিনে মন্দির প্রতিষ্ঠা হ'ল।

দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দির।

এর পূজারী রামকুমার।

কামারপুকুরের ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের বড় ছেলে রামকুমার। গদাধরের বড় ভাই রামকুমার।

মন্দির প্রতিষ্ঠাব দিন গদাধর এলেন দক্ষিণেশ্বরে। সেই দিন দেবী ভবতারিণীর সঙ্গে তাঁব প্রথম সাক্ষাৎ। মায়ে পোয়ে প্রথম দেখা।

মা ভবতাবিণী। আর পুত্র গদাধর।

এই ঘটনার কয়েক দিন পর থেকেই গদাধর র'য়ে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে।

একদিন দাদা রামকুমার পীড়াপীড়ি করেন, ওরে, কাজ তো একটা করতেই হবে। তবে ভবতারিণীর মন্দিরে থেকে কেন কিছুই করিস নে।

রাণীরও তাই ইচ্ছা। মথুর বাবুরও।

ইতিমধ্যে মা ভবতারিণী গদাধরকে বড়ই আপন ক'বে নিয়েছেন।

গদাধর ভাবলেন, মন্দ কি। ভালোই হ'ল।

গদাধর দেবীর বেশকারীর কাজ নিলেন।

দিন যায়।

গদাধর হয়েছেন দেবীর অন্যতম পূজারী।

দেবী ভবতারিণীর সঙ্গে পূজারী গদাধরের অন্তরঙ্গতা বেড়েই চলে।

গদাধর মনের মত কাজ পেয়েছেন। সারা দেহ মন প্রাণ নিঃশেষে ঢেলে তিনি মায়ের পূজা করেন। ভক্তির প্লাবন ব'য়ে যায় তখন মন্দিরে।

পূজা করতে বসেছেন। তখন দেখা যায় নানা ধরণের দিব্য বিভূতি। অঙ্গন্যাস করন্যাস করছেন। তখন তাঁর নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে খেলে যায় জ্যোতির ছটা। হয়ত ভূতশুদ্ধি করছেন। দেখছেন পূজামণ্ডপে জ্বলে উঠেছে অলৌকিক আগুনের শিখা। পূজার অনুষ্ঠানকে রক্ষা করছে। মাকে আবাহন করছেন মন্ত্রের সাহায্যে। মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহ দিব্যভাব ধারণ করে। পূজারী গদাধরের দেহ যেন দেবদেহ।

পূজা শেষ হ'লে গদাধর মায়ের গান করেন। অপূর্ব সুধামাখা কণ্ঠ। তার সঙ্গে মিশেছে ভাব আর ভক্তি। যে শোনে সেই-ই মুগ্ধ হয়।

দিন যায়।

মা ভবতারিণীকে দেখবার জন্যে গদাধরের জাগে প্রবল আকাঙ্ক্ষা! প্রস্তর বিগ্রহ রূপে নয়, একেবারে জীবন্তরূপে, সশরীরে।

গদাধরের ধারণা হ'ল মা-র দেখা না পেলে এ জীবন রেখে লাভ নেই। তখন আসে কান্না। তাঁর সে কান্না শুনে সকলেরই চোখে আসে জল।

একটা দিন চ'লে যায়। কান্না আরও বেড়ে ওঠে।

মা গো, আর একটা দিন যে চ'লে গেল। বৃথাই গেল আমার কান্না কি তুই শুনিস নে?

ঘাসে মুখ ঘষেন। যন্ত্রণায় ছটফট করেন। মাকে দেখবার জন্যে সে কী টান! সতীর পতির উপর টান, বিষয়ীর বিষয়ের 'পরে টান, আর কৃপণের ধনের উপর যে টান তার চাইতেও বেশী টান হয়েছে গদাধরের মাকে পাবার জন্যে।

মা, মাগো আমি ধনজন ভোগসুখ কিছুই চাইনে। আমায় দেখা দে। দেখা দে।

কাঁদতে কাঁদতে বুক ভেসে যায়।

কাঁদতে কাঁদতেই হৃদয়ের ভার কিছুটা হয়ত লাঘব হয়। তখন আবার গান ধরেন দেবীকে প্রসন্ন করবার জন্যে।

মা তবুও কি দেখা দেন?

গদাধর মাকে বলেন, মা, এত যে ডাকছি, তুই কি শুনছিস নে? ভক্ত রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমাকে কেন দেখা দিবি নে?

একদিন শোকে পাগলের মত হ'য়ে মন্দিরের খড়্গ নিয়েই গিয়েছেন নিজের জীবন নাশ করতে।

মার দেখা না পেলে জীবন রেখে লাভ কি?

এই অবস্থার কথা ঠাকুর নিজে বলছেন—

মা-র দেখা পেলাম না ব'লে তখন হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা। জলশূন্য করবার জন্যে লোকে যেমন সজোরে গামছা নিঙড়োয়, মনে হ'ল, হৃদয়টাকে ধ'রে কে যেন সেই রকম করছে। মা-র দেখা বোধ হয় কোনও কালেই পাবো না ভেবে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলাম। অস্থির হ'য়ে ভাবলাম তবে আর এ জীবনে দরকার নেই। মা-র ঘরে যে খড়্গ ছিল চোখ সহসা তার উপর পড়লো। এই দণ্ডেই জীবন অবসান কোরবো ভেবে উন্মত্তের মত ছুটে যেই খড়্গ ধরতে যাচ্ছি অমনি মা-র দর্শন পেলাম।

জ্যোতির্ময়ী মূর্তিরূপে মা দেখা দিলেন গদাধরকে।

গদাধর সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন।

এই দিব্য দর্শনের কথা ঠাকুর নিজ মুখে বলছেন—ঘর দুয়ার মন্দির সব কিছু যেন মিলিয়ে গেছে। কোথাও কিছু নেই। কেবল

এক অনন্ত চেতনার, জ্যোতিসমুদ্র। যেদিকে যতদূর দেখি তার ঢেউ আমায় গ্রাস করতে আসছে। অবশেষে আমায় একেবারে তলিয়ে দিল। আমি হাঁপিয়ে হাবুডুবু খেয়ে সংজ্ঞাহীন হ'য়ে পড়লাম।

এই দিব্য দর্শনের পর দুই দিন তাঁকে নিরন্তর ভাবাবিষ্ট থাকতে দেখা যায়।

মাকে দেখে, তারপর অদর্শনে তাঁর দেখা গেল দারুণ বিরহ যন্ত্রণা। জীবন যেন দুঃসহ হ'য়ে পড়লো। শুধু কান্না। শুধু বিলাপ। তার আর বিরাম নেই।

মা গো, কৃপা কর! আমায় দেখা দে!

কান্নার বেগ বেড়ে যায়। মার বিরহে যেন তিনি পাগল। পাথরে মুখ ঘষেন। মুখ দিয়ে রক্ত বেরোয়। বলেন,

পাষাণী, এখনও তুই দেখা দিবি নে?

মাঝে মাঝে মাকে উদ্দেশ ক'রে বলেন,—

মাগো, আমার কি হচ্ছে, কিছুই বুঝিনে। তোকে ডাকবার মন্ত্রতন্ত্রও জানিনে আমি। যা' করলে তোকে চিরতরে পাওয়া যায়, তাই তুই আমায় শিখিয়ে দে। তুই ছাড়া আমার সহায় বা গতি যে আর কেউ নেই।

অবশেষে মা-র কৃপা হ'ল।

ঠাকুর বলেন, তখন থেকে প্রায়ই দেখতাম মা-র বরাভয়-করা চিন্ময়ী মূর্তি। দেখতাম, ঐ মূর্তি হাসছে, কথা কইছে, নানা প্রকারে সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিচ্ছে।

আগে শুধু পূজার সময় বা ধ্যানের সময় মা-র দেখা পেতেন। এখন থেকে সব সময়েই তাঁর সাক্ষাৎ ঘটতে লাগলো।

ভোর বেলায় ফুল তোলেন, মালা গাঁথেন। মা-ও দিব্য-মূর্তিতে তাঁর পাশে পাশে থাকেন। মায়ে পোয়ে তখন চলে আলাপ। তখন দুজনের কত হাসি, কত আনন্দ! কত রঙ্গ তখন!

পূজাঘরে, মন্দির-চত্বরে, বাগানে যেখানে গদাধর বেড়ান মা ভবতারিণী তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যান।

সব সময়েই দেন নির্দেশ—এটা কর। ওটা করিসনে।

ভবতারিণীকে ঠাকুর ভোগ নিবেদন করতে বসেন। তিনি দেখেন, দেবীর নয়ন থেকে যেন জ্যোতির ছটা বেরিয়ে ভোগান্নের উপর পড়ছে। দেবী আবার তা' সংহরণ ক'রে নেন। বিগ্রহ যেন জীবন্ত তখন।

এক একদিন এমনও হয়, ঠাকুর হয়ত ভোগ নিবেদন শেষ করেননি। মা-র বিলম্ব সইছে না। সারা মন্দির আলোয় আলোময় ক'রে তিনি তক্ষুনি খেতে বসলেন। ঠাকুর বলেন, রোস্, রোস্, আগে মন্ত্রটা বলি। তারপর খাস্।

ঠাকুর বলেন, নাকে হাত দিয়ে দেখেছি, মা সত্যিই নিঃশ্বাস ফেলছেন। মন্দির দেয়ালে চিন্ময়ীর কোনও ছায়া পড়তো না। নিজের ঘরে ব'সে ব'সে শুনেছি, মা পাঁয়জোর প'রে আনন্দময়ী ছোট্ট একটি মেয়ের মত ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ ক'রে মন্দিরের উপর তলায় যাচ্ছেন। তিনি বলেন, দ্রুতপদে ঘরের বাইরে এসে দেখি, সত্যি সত্যি মা মন্দিরের দোতলার বারান্দায় এলোচুলে দাঁড়িয়ে কখনও গঙ্গার কখনও বা কলকাতার শোভা দেখছেন।

মা শুধু নিজের বেশেই দেখা দিতেন না ঠাকুরকে। দেখা দিতেন নানা বেশে, নানা ভাবে, নানা মূর্তিতে।

একদিন এক মুসলমানের মেয়ে হ'য়ে মা চ'লে এলেন। ছয় সাত বছরের মেয়ে। মাথায় তার তিলক। পরনে কাপড় নেই - দিগম্বরী। গদাধরের সঙ্গে বেড়াতে লাগলো। কত রঙ্গ করতে লাগলো। ঠাট্টা তামাসা! একবার চোখ নাচালো। অমনি নিমেষে যেন নীল আকাশে গ্রহ তারা সব নেচে উঠলো একই সঙ্গে।

কালো পেড়ে কাপড় প'রে শ্রীগৌরাঙ্গ বেশ ধ'রে একদিন দেখা দিয়েছিলেন হৃদয়ের বাড়ীতে।

রতির মা-র বেশেও একদিন দেখা দিলেন ঠাকুরকে। রতির মা। লালা বাবুর রাণী কাত্যায়নীর মোসাহেব। গোঁড়া বৈষ্ণবী। দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই যেতেন। তাঁর কি ভক্তি! কিন্তু যেই দেখলেন গদাধর কালীর প্রসাদ খাচ্ছেন, অমনি রতিব মা পালিয়ে গেলেন। গোঁড়া বৈষ্ণবী যে। সেই রতির মা-র বেশেই মা দেখা দিলেন একদিন। যা শক্তি তাই বৈষ্ণবী। মা বললেন, ওরে, তুই ভাবমুখে থাক্। ভাবমুখেই থাক্!

হৃদয়ের সঙ্গে ঠাকুর একবার কালীঘাটে গিয়েছেন। সেখানে দেখলেন, পূবের পুকুব পাড়ে কচুবনের মধ্যে মা কুমারী বেশে আরও কয়েকটি কুমারীব সঙ্গে ফড়িং ধরার খেলা করছেন।

দেখেই ঠাকুর মা মা ব'লে ডেকে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুরের সমাধি হ'ল।

সমাধি ভঙ্গেব পর মন্দিবে এসে দেখলেন, মা যে শাড়ী প'বে কুমাবীদের সঙ্গে খেলা করছিলেন, সেই শাড়ীখানিই মন্দিরে মা-র গায়ে জড়ানো।

ওরে হৃদে, একেই যে তখন দেখলুম। ছুটোছুটি করছে!......

হৃদয় ব'লে উঠলেন—তখন বলোনি কেন? ছুটে গিযে ধ'রে ফেলতুম মাকে।

তা' কি হয়রে! তিনি যদি কৃপা ক'রে ধবা না দেন তো তাঁকে কি ধরা যায়?

এদিকে ধীরে ধীরে ঠাকুরের সঙ্গে মা-র একাগ্রতা বেড়েই চলে। তাঁব দৈবী ভক্তির বাঁধন হ য়ে পড়ে শিথিল। পূজা ও ভোগ নিবেদনের নিয়ম কানুন মানা আর সম্ভব হ'য়ে ওঠে না।

ঠাকুর পাগল হ'য়ে গেলেন নাকি? লোকে বলতে শুরু করলো। জবা বিল্বদল নিয়ে অর্ঘ্য সাজিয়ে ঠাকুর কখনো নিজের মাথায় রাখেন, ভাবাবেশে কখনও বা বুকে, এমন কি নিজের পায়েও ফেলে দেন।

শুধু কি তাই! ওই ফুল, ওই বেলপাতা কুড়িয়ে ফিরে দেন দেবীর পাদপদ্মে অঞ্জলি। কখনও বা ভাবাবেশে চোখ হয় রক্তবর্ণ। টলতে টলতে পূজার আসন ছেড়ে দেবীর সিংহাসনের উপর অবলীলাক্রমে নিজের পা তুলে দেন। চিবুক স্পর্শ করেন সস্নেহে! কত আদর করেন! কখনও মায়ের মূর্তি ধ'রে নাচতে থাকেন আনন্দে।

নিবেদিত অন্ন ব্যঞ্জন ঠাকুর তুলে ধরেন। মাকে নিজ হাতে খাওয়াতে থাকেন। বলেন, খা' খা' খা', বেশ ক'বে খা'। কখনও বা বলেন মা, আমায় কি বলছিস? আমি খাব? আচ্ছা, আচ্ছা, আমি খাচ্ছি। নিজে ভোগান্ন খেয়ে কখনও সেই এঁটো ভাত আবার মায়ের মুখে তুলে ধরেন। তাঁর কোনও হুঁশ থাকে না। তিনি বলেন, আমি তো খেয়েছি। এইবার তুই খা'।

ভাগ্নে হৃদয় বলছেন, একদিন রাতে দেখি, ভবতারিণীকে শয়ন দিয়ে মামা 'আমাকে কাছে শুতে বলছিস—আচ্ছা, শুচ্ছি' ব'লে মা-র রূপার খাটে কিছুক্ষণ শুয়ে রইলেন।

একদিন মথুর বাবু স্বচক্ষে দেখলেন এই সব। তিনি কেঁদে ফেললেন। এ কী অদ্ভুত প্রেমভক্তি এই তরুণ পূজারীর! এমন ভক্তি, এমন ব্যকুলতাতেও যদি মন্দিরের দেবী জাগ্রত না হন, তবে আর কিসে হবেন?

রাণী রাসমণি ও মথুর বাবু বুঝলেন, বহু পুণ্যের ফলে তাঁরা এমন সাধক, এমন ভক্ত পূজারী পেয়েছেন।

তাঁরা ভাবলেন, এত দিনে দেবী প্রতিষ্ঠা সার্থক হ'ল। এত দিনের পর জগন্মাতা সত্যি সত্যিই এখানে আবির্ভূত হলেন। এতদিনে মা-র পূজা ঠিক ঠিক সম্পন্ন হ'ল।

মাঝে মাঝে ঠাকুর ভাবতেন, আমার এ কি প্রকার অবস্থা হচ্ছে! আমি ঠিক পথে চলছি তো!

মা, আমার এমন অবস্থা কেন হচ্ছে তা' কিছুই বুঝতে পারছিনে।

তুই আমাকে যা' করবার আর যা' শিখবার শিখিয়ে দেখা দে। সব সময়ে আমার হাত ধ'রে থাক।

মথুর বাবু চৌদ্দ বছর ঠাকুরের ও তাঁর ভক্তদের সেবা করেছিলেন। সে-ও মার নির্দেশে।

ঠাকুর বলেন, মা-কে বলেছিলাম, এ দেহ কেমন ক'রে রক্ষা হবে, আর, সাধু ভক্তদের নিয়ে কেমন ক'রেই বা থাকবো। তাই-তো সেজবাবু চৌদ্দ বছর সেবা করলে।

মথুর বাবুর সঙ্গে একবার ঠাকুরের তর্ক হয়।

মথুর বাবু বললেন, ঈশ্বর আইন করেছেন ঠিকই। কিন্তু তাঁকেও তো নিজের বিধান মেনে চলতে হয়।

ঠাকুর অবাক হ'য়ে পড়েন।

সে কি গো! এ আবার কি কথা! তাঁর আইন তিনি সব সময়ে যে রদ করতে পারেন।

মথর বাবু যুক্তিবাদী। তিনি সহজে একথা মানতে রাজী নন।

তা কি ক'রে হবে, বাবা? লাল ফুলের গাছে যে লাল ফুল হতেই হবে। সাদা ফুল সেখানে হবে কি ক'রে?

পরদিন ঠাকুর গিয়েছেন বাগানে। দেখেন এক অলৌকিক কাণ্ড। একটা লাল জবা গাছে সাদা জবাও ফুটে রয়েছে। একই ডালে দুই রঙের ফুল। তখুনি ছুটে গিয়ে মথুর বাবুকে দেখালেন।

মথুর বাবুর হার হ'ল।

একদিন কথায় কথায় ঠাকুর বললেন মথুর বাবুকে —

ছাখ, মা আমায় দেখিয়ে দিয়েছেন এখানকার সব ঢের অন্তরঙ্গ ভক্ত আছে। তারা সব আসবে। আর এখান থেকে ঈশ্বরকে লাভ করবে। মা এই খোলটা দিয়ে অনেক খেলা খেলবে। অনেকের কল্যাণ করবে। তাই এটাকে রেখেছে। এখনও ভাঙেনি। হ্যাঁ গা, তুমি কি বল? এ সব কি ভুল?

না বাবা, তোমার মা এ অবধি কোনটাই ভুল দেখান নি। তবে

এ কেন ভুল হ'তে যাবে? নিশ্চয়ই তারা আসবে। কিন্তু, বাবা, তারা দেরী করছে কেন? শীগগীর আসুক না। তাদের নিয়ে আমি আনন্দ করি।

মাঝে মাঝে ঠাকুর নিরাশ হ'য়ে পড়েন। এখনও যে তারা কেউ-ই এলো না!

মথুর বাবু বলেন, তাতে আর কি হয়েছে, বাবা? আমি একাই যে তোমার একশো ভক্ত।

কি জানি বাবু, তারা আসবে। এটা যে মা আমায় দেখিয়ে দিলেন।

হ্যাঁ, এসেছিলেন অন্তরঙ্গ ভক্তরা এই দক্ষিণেশ্বরে। এসেছিলেন ঠাকুরের কাছে। একজন নয়, তুইজন নয়। বহু।

এসেছিলেন নরেন, রাখাল, বাবুরাম, কালী, লাটু মাস্টার প্রভৃতি।

এসেছিলেন গিরিশ। বিনোদিনীও এসেছিলেন।

এসেছিলেন ·লরাম, শম্ভু মল্লিক।

এসেছিলেন কেশব চন্দ্র সেন, বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী, তোতাপুরী, জটাধারী, ব্রাহ্মণী—এঁরা।

এসেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন—এঁরাও।

এসেছিলেন নানান স্তরের গুণী জ্ঞানীরা, অসংখ্য ভক্তজনেরা।

একদিন গদাধর মা-কে জানালেন, মা গো, বিষয়ী, সংসারী লোকদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে জিভ যে জ্বলে পুড়ে গেল, মা।

মা দেখা দিয়ে বললেন, ভয় নেই। শুদ্ধ সত্ত্ব ত্যাগী ভক্তরা আসছে একে একে।

মা, একজনকে সঙ্গী ক'রে দাও আমার মত। আমার তো সন্তান হবে না। ইচ্ছে করে, মা, একটি শুদ্ধ সত্ত্ব ছেলে আমার সঙ্গে কাছে কাছে থাকে। তেমনি একটি ছেলে আমায় দাও।

এর কিছুদিন বাদে ভাবচক্ষে গদাধর দেখতে পেলেন, বটতলায় একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।

হৃদয় আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, মামা, নিশ্চয়ই তোমার ছেলে হবে। তাই দেখেছ।

সে কিরে! সে কিরে! আমাব যে মাতৃযোনি! আমার ছেলে হবে কেমন ক'রে?

গদাধর একদিন ব'সে আছেন নিবালায়।

হঠাৎ মা এসে তাঁর কোলে একটি ছেলে দিয়ে চ'লে গেলেন। মা বললেন, ছেলে চেয়েছিলে। এই তোমার ছেলে।

সে কি! আমার আবার ছেলে! মা বুঝিয়ে দিলেন—

না, শরীরের পুত্র নয়। মানস পুত্র।

এব কয়েকদিন বাদে রাখাল এসেছেন একদিন ঠাকুবের কাছে। রাখাল চন্দ্র ঘোষ।

ঠাকুব দেখলেন, সেই দিনকার ভাবমুখে দেখা হুবহু সেই ছেলেটি।

বাখাল—ঠাকুবেব মানসপুত্র রাখাল। উত্তরকালে যিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে খ্যাত হযেছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে নহবতে থাকেন সাবদামণি। জননী সাবদামণি।

একদিন একজন মহিলা এসে তাঁকে অনেক বোঝালেন।

তোমাব স্বামী নিযে ঘর সংসাব কবতে হবে না? তোমার স্বামীকে কি তুমি ভেসে যেতে দেবে? সংসাবে তাব মন নেই। তা' তুমি বোঝ না? তুমি তাব ধর্মপত্নী। ধর্মপত্নী হ'য়ে এমন অধর্ম ঘটাবে!

অধর্ম!

তা' নয় তো কি! তোমাকে বিয়ে কবেছে, অথচ তোমাকে নিয়ে ঘর সংসার করলো না! তুমি তার স্ত্রী। তুমি মা হবে না? যাও আজই বলবে। বলবে সোজাসুজি। আমি সন্তান চাই। আমি মা হবো।

সরলতার প্রতিমূর্তি সারদামণি।

গদাধরকে গিয়ে বললেন এই কথা।

সবাই বলছে, আমার একটাও ছেলে পুলে হবে না? বিয়ে হয়েছে। তা' নইলে সংসার-ধর্ম বজায় থাকবে কিসে?

চমকে ওঠেন গদাধর।

সারদা ঠাকুরের পা টিপতে থাকেন।

গদাধর বুঝতে পেরেছেন, এ মহামায়ার চাতুরী। তিনি মা ভবতারিণীকে বললেন, তোর চালাকি ধরতে পেরেছি, মা। তুই এতদিন নিজের মূর্তিতে এখানে ছিলি। আজ তোর এ কী খেয়াল, মা, তুই আমার স্ত্রীর রূপটি ধ'রে এলি আমার কাছে! তুই যদি তা-ই আসতে পারিস, মা, আয় না আমার কাছে! তুই নিজে আসতে পারলে আমার ভয় কি, মা!

সারদা আড়ষ্ঠ হ'য়ে শুনলেন এই কথা।

তুমি মা হ'তে চাও? তা' মোটে একটি ছেলে খুঁজছ কি গো? দেশ দেশান্তর থেকে তোমার কত ছেলে আসবে, সব মাতৃমন্ত্রে পাগল হবে! তুমি যে তখন মা-ডাকে তিষ্ঠোতে পারবে না।

হ্যাঁ, ভালোই হ'ল। মহামায়া ঠিক ঠিক ভাবই জাগিয়ে দিয়েছেন তোমার মধ্যে। তুমি মা হবে। মা হবে তুমি। তুমি যে বিশ্বজননী। তোমার মধ্যে এই মাতৃভাব না থাকলে চলবে কেন?

সারদামণি শুনলেন এই কথা।

আনন্দে ঘুমিয়ে পড়লেন। জননী সারদামণি।

তোতাপুরী এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। নাগা সন্ন্যাসী। পরণে একখানা কৌপীন পর্যন্তও নেই। মাথায় দীর্ঘ জটা। তেজঃপুঞ্জ কলেবর। বিরাট ও বলিষ্ঠ দেহ—অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী।

চল্লিশ বছর কঠোর সাধনায় তোতা নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেছিলেন। নির্বিকল্প সমাধি ব্রহ্মজ্ঞানলাভের যেন দুয়ার। গদাধরকে দেখেই তিনি ব্রহ্মজ্ঞান সাধনার সর্বোত্তম অধিকারী ব'লে

বুঝতে পারলেন। আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন, সাধন করবে? বেদান্ত সাধন?

তার আমি কি জানি?

সে কি! তুমি জান না? তবে কে জানে?

আমার মা! স-ব আমার মা জানে।

কে তোমার মা?

আমার মা-কে জান না? ঐ মন্দির-অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভবতারিণীই আমার মা।

সন্ন্যাসী হেসে উঠলেন। বিদ্রূপের হাসি। একটা পাথরের পুতুল, সে আবার মা!

শোন, ঈশ্বর এক। দেব-দেবী সে সবই ভ্রম।

"জ্ঞানমার্গের সন্ন্যাসী তোতাপুরী বেদান্ত-উক্ত কর্মফলদাতা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মাত্রে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তাঁকে ভক্তি ও উপাসনা করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন না। ত্রিগুণময়ী ব্রহ্মশক্তি মায়াকে তিনি ভ্রম মাত্র বলিয়া জানিতেন এবং উহার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব স্বীকারের বা উহার প্রসন্নতার জন্য উপাসনার আবশ্যকতা মানিতেন না। তাঁহার মতে, অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইবার জন্য সাধকের কেবলমাত্র পুরুষকারই অবলম্বনীয়। তাহার জন্য ঈশ্বর বা শক্তি-সংযুক্ত ব্রহ্মের করুণাভিক্ষার প্রয়োজন নাই। কেননা, উহা কুসংস্কার মাত্র।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ)

তোতাপুরী ব'লে চললেন, সে যাক্—তোমার মাকেই একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ।

গদাধর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম তোতাপুরি না?

তুমি কি ক'রে জানলে?

গদাধর হাসলেন। এলেন ভবতারিণীর কাছে।

মা, তোতাপুরী বলছে নিরাকার সাধন করতে। করব মা?

করবে বৈকি! তোমাকে শেখাবার জন্তেই এখানে তাঁর আসা।

হ্যাঁ, মা মত দিয়েছেন। দীক্ষা নেব তোমার কাছে। আমাকে তোমার চেলা ক'রে নাও।

যথাবিধি দীক্ষা দিলেন তোতাপুরী গদাধরকে।

গদাধরের নোতুন নাম হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

"গুরুমুখে আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ শুনিয়া তিনি মনন ও নিদিধ্যাসনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ব্রহ্মজ্ঞ গুরুকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করিয়া এক দিনেই নির্বিকল্প সমাধি সাগরে ডুবিয়া গেলেন। তিন দিনের ভিতরে সেই সমাধি হইতে আর ব্যুত্থিত হইলেন না।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ)

শিষ্যপ্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে তোতাপুরী, যিনি তিন দিনের বেশী এক জায়গায় থাকতেন না, একাদিক্রমে এগার মাস দক্ষিণেশ্বরে থেকে গেলেন।

এক সময়ে দারুণ রক্ত আমাশয় হ'ল তোতাপুরীর। সব সময়েই পেটে অসহ্য যন্ত্রণা।

মন আর নিবিষ্ট হয় না। ব্রহ্ম ছেড়ে মন এখন শুধু শরীরেই লেগে রয়েছে। মনকে শরীর হ'তে টেনে নিয়ে সমাহিত করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পেটের যন্ত্রণায় মন সেই দিকেই ছুটল। সমাধিভূমিতে উঠতে না উঠতে নেমে পড়তে লাগলো।

তোতাপুরী ভাবলেন, এ দেশ ছেড়ে পালাই।

যাই যাই ক'রে যাওয়া আর হয় না।

মাঝে মাঝে বিচার বুদ্ধির জোরে মনকে প্রবোধ দেন। শরীর থাকলে রোগ থাকবেই। এ অস্বাভাবিক কিছু নয়।

কিন্তু রোগ বাড়তেই লাগলো।

একদিন অসহ্য যন্ত্রণায় ধিক্কার এলো জীবনে। এই শরীরটার জন্যেই মনকে বশে আনতে পারছিনে। শরীরের উপর ভীষণ চটে গেলেন তিনি।

এ শরীর আর রাখবই না। হাড় মাংসের খাঁচাটাকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে চিরতরে সকল যন্ত্রণার অবসান করবো।

তোতাপুরী ঠিক করলেন সেদিনেই গঙ্গায় ডুবে দেহ-ত্যাগ করবেন।

নামলেন জলে। কী আশ্চর্য! যত এগোন, জল হাঁটুর উপরে

আর ওঠে না। জল যেন ক্রমশ শুকিয়ে যেতে লাগল। ওপারের প্রায় কাছাকাছি এলেন। সেখানেও হাঁটু জল। ডুবে মরবার জল নেই।

এ কেয়া দৈবী মায়া!—এ কী ঈশ্বরের অপূর্ব লীলা!

হঠাৎ তাঁর সত্য উপলব্ধি হ'ল। যে অব্যয় অদ্বৈত ব্রহ্মকে এতকাল ধ্যান ক'রে এসেছেন, আজ তাঁকে দেখতে পেলেন মহাশক্তিরূপে। তিনি বুঝলেন, যা ব্রহ্ম, তাই ব্রহ্মশক্তি। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। কিন্তু শক্তিতেই জীবজগৎ।

"অমনি কে যেন ভিতর হইতে তাঁহার বুদ্ধির আবরণ টানিয়া লইল। তোতার মন উজ্জ্বল আলোকে ধাঁধিয়া যাইয়া দেখিল—মা, মা, মা, বিশ্বজননী মা, অচিন্ত্যশক্তিরূপিণী মা। জলে মা, স্থলে মা; শরীর মা, মন মা; যন্ত্রণা মা, সুস্থতা মা, জ্ঞান মা, অজ্ঞান মা; জীবন মা, মৃত্যু মা, যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি, কল্পনা করিতেছি—সব মা। তিনি হয়কে নয় করিতেছেন, নয়কে হয় করিতেছেন। শরীবেব ভিতর যতক্ষণ ততক্ষণ তিনি না ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে কাহারও সাধ্য নাই—মরিবারও কাহারও সামর্থ্য নাই। আবাব শরীর মন বুদ্ধিব পাবেও সেই মা—তুরীয়া নির্গুণা মা।—এতদিন যাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া তোতা প্রাণের ভিতর ভক্তি-ভালবাসা দিয়া আসিয়াছেন, সেই মা শব-শক্তি একাধারে হরগৌরী মূর্তিতে অবস্থিত।—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ)

জগদম্বার বিরাট রূপ দেখতে দেখতে তোতাপুরী ভাবে অভিভূত হ'য়ে পড়লেন। কণ্ঠে শুধু মা, মা। মায়ের পায়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বলি দিয়ে সারা রাত মার নামে ও ধ্যানে কাটালেন। প্রাণ আনন্দে উল্লসিত হ'য়ে উঠল।

নিমেষে রোগ দূর হ'ল। উৎকট রোগের চিহ্নও আর রইল না।

প্রভাতে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে।

এ কী হ'ল তোমার! কেমন আছ?

রোগ আমার সেরে গেছে।

রোগ সেরে গেছে! কী ক'রে?

বললেন সব কথা।

রোগই আমার বন্ধুর কাজ করেছে। কাল জগদম্বার দর্শন পেয়েছি। রোগমুক্ত হয়েছি তাঁর কৃপায়। এতদিন কি অজ্ঞই না ছিলাম! সে যাক্। তোমার মা-কে ব'লে ক'য়ে এখন আমাকে এখান থেকে বিদায় করিয়ে দাও। আমি বুঝেছি, তিনিই আমাকে এই শিক্ষাটি দেবার জন্যে এতদিন এখানে আটকে রেখেছেন।

দেখেছ? আমার মা-কে দেখেছ?

রামকৃষ্ণের আনন্দ আর ধরে না।

হ্যাঁ, দেখেছি। আমারও মা-কে। জগতের মা-কে।

কেমন, বলেছিলাম না! রামকৃষ্ণ আনন্দে নেচে উঠলেন। মা-কে যে আগে মানতে না, আমার সঙ্গে যে শক্তি মিথ্যে, 'ঝুট্' ব'লে তর্ক করতে! এখন দেখলে, চোখ কানের বিবাদ ঘুচে গেল! আমায় তিনি আগে বুঝিয়েছেন, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। আগুন আর তার দাহিকা শক্তি যেমন পৃথক নয়, তেমনি

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।

তোতাপুরীরও আনন্দ। প্রেমে, ভক্তিতে তিনি অভিভূত হ'য়ে পড়লেন। বললেন—

হ্যাঁ, আমি দেখেছি তোমার মা-কে, আমার মা-কে, সকলের মা-কে।

দেখলে তো! দেখলে তো! আমার মা-কে না দেখে কি তুমি যেতে পার? সাধ্যি কি? যোগে ব'সে এত দেখেছ, আর আমার মহাযোগীশ্বরী মা-কে দেখবে না! তাঁকে না দেখেই চ'লে যাবে! সাধ্যি কি? সাধ্যি কি তোমার?

এবার মা-কে ব'লে আমায় ছুটি করিয়ে দাও। আমি চ'লে যাই। —বললেন তোতাপুরী।

কেন? তোমারও মা না? তুমিই বল। তুমিই বল। —হাসতে লাগলেন রামকৃষ্ণ।

তোতাপুরী গেলেন ভবতারিণীর মন্দিরে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন মা-কে।

মা, মা, মা!

অনুমতি দিলেন মা সুপ্রসন্ন হাস্যে।

রামকৃষ্ণকে বিদায় জানিয়ে তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করলেন।

নরেন্দ্রনাথ।

উত্তরকালে যিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে জগদ্বিখ্যাত হয়েছিলেন। সেই নরেন্দ্রনাথ।

সিমুলিয়ার বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে। দুর্ধর্ষ, ডাকসাইটে।

গলার জোরে, গায়ের জোরে নরেন্দ্রের জুড়ি নেই।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে গিয়ে নরেন্দ্রনাথ গান করেন। মিল, স্পেন্সার এই সব বই পড়েন।

তাঁকে এক দিন রাম দত্ত বললেন, এই বিলে, শোন। দক্ষিণেশ্বরে এক পরমহংস আছেন। দেখতে যাবি তাঁকে?

শুনেছি সে তো মুখ্‌খু। কী তার আছে যে শুনতে যাবো, দেখতে যাবো? মিল, হ্যামিলটন, স্পেন্সার,—এই সব এত পড়লুম, কোনও কুল কিনারা পেলুম না! ঐ একটা কৈবর্তের বামুন। কালীর পূজারী। ও কি জানে!

একবার গিয়ে কথা কয়েই ছাখ্ না।

কি ভাবলেন নরেন্দ্র।

বেশ, যদি রসগোল্লা খাওয়াতে পারে তো ভালো। নইলে কান ম'লে দেবো কিন্তু বলছি।

সার কৈলাস বোসও রাম দত্তকে এই একই কথা বলেছিলেন, কান ম'লে দেবো তার। সুরেশ মিত্রও কান মলতে চেয়েছিলেন।

এঁরা কিন্তু সবাই কান মলা খেয়েই ফিরে এসেছিলেন।

রাস্তায় একদিন লাটুর (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) সঙ্গে দেখা নরেন্দ্রের।

ওরে, তোদের ওখানকার খবর কি ? দক্ষিণেশ্বরের খবর ?

কাল ওখানে কত উৎসব হ'ল। আপনি গেলেন না কেন ? আমার সঙ্গে আজ চলুন ওখানে। যাবেন ?

ব'য়ে গেছে আমার। সামনে এগজামিন। এখন এক পাগলা বামুনের সঙ্গে ব'সে আড্ডা দেবার সময় আমার নেই। বুঝলি ?

পাগলা বামুন। পাগলা বামুন আপনি কাকে বলছেন ?

আর কাকে ? পরনে থাকে না কাপড়। মাঝে মাঝে হাত পা কেমন বেঁকে যায়। নাম শুনলেই নাচে ধেই ধেই ক'রে। মান ইজ্জতের বালাই নেই। যেখানে সেখানে খালি গায়েই যাওয়া আসা করে। তারপব আবার ভেল্‌কি দেখান আছে।

ভেল্‌কি।

তা' ছাড়া আবার কি।

প্রথম প্রথম এই তো নবেন্দ্রের ধারণা ঠাকুব সম্বন্ধে।

এইবার ঠাকুরের কথা—

একদিন বাবুবাম (স্বামী প্রেমানন্দ), রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), এঁরা ঠাকুবের কাছে শুয়ে রয়েছেন।

ঠাকুরের ঘুম আসে না।

ওগো, ঘুমুলে ?

আজ্ঞে না, ঘুমুইনি।

ওগো, আমার ঘুম আসছে না নরেনেব জন্যে। বুঝলে, আমার প্রাণের ভিতরটা যেন মোচড় দিচ্ছে। যেন জোরে কে গামছা নিংড়োচ্ছে বুকটার মধ্যে। তাকে একবার নিয়ে আসতে পারো ?

আজ্ঞে, ভোর হোক। ভোর হ'লেই তাকে সংবাদ দেবো।

তাই কোরো। শুধু একবারটি একটু চোখের দেখা। তাকে মাঝে মাঝে না দেখে থাকতে পারিনে।

বাবুরাম ভাবেন, কি নিষ্ঠুর এই নরেন্দ্রনাথ !

মা গো, তাকে এনে দে। তাকে না দেখে থাকতে পারছিনে। মা, এককালে তোর জন্যে কত কেঁদেছিলাম! এখন নরেনের জন্যেই কাঁদছি! তুই দেখা দিলি, আর নরেন দেখা দেবে না! আমার এই কান্না তার কানে পৌঁছে দে মা। তুই পাষাণী হ'য়ে শুনতে পেলি, আর, রক্ত মাংসেব মানুষ হ'য়ে নরেন শুনতে পাবে না!

ভক্তদের বলেন, এত কাঁদলাম। কিন্তু কৈ, নরেন তো এলো না! এত বোঝে সে, আর আমাব প্রাণেব টানটাই বোঝে না!

নিজে নিজেই বলেন, বুড়ো মিনসে, পরের একটা ছেলের জন্যে এমন কাঁদছি, লোকে দেখলে কি বলবে, বলো দেখি? ছাখ, তোমরা আমার আপনাব লোক। তোমাদেব কাছে না হয় লজ্জা নেই, কিন্তু অন্যে কি বলবে? অন্যে কি বলবে ভেবেও তো সামলাতে পারছি নে।

নবেনের জন্যে ঠাকুরেব এমনই আকুলি বিকুলি!

এই নবেন এলেন ঠাকুরেব কাছে। একবাব নয়। এলেন বাব বার।

শেষে একেবাবে ঠাকুবেরই হ'য়ে গেলেন।

ঠাকুব দিনবাত নরেন, নরেন করেন। নরেনেব চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসেছে।

একদিন নরেন ঠাকুরকে বললেন,

পুরাণে আছে, ভরত রাজা হরিণ ভাবতে ভাবতে মৃত্যুর পরে হরিণ হয়েছিলেন। এ যদি সত্যি হয়, তা হ'লে আমার বিষয়ে এত চিন্তা করার পরিণাম ভেবে আপনার সতর্ক হওয়া উচিত।

শিশুর মত সরল ঠাকুর নরেনের মুখে এই কথা শুনে খুবই ভাবনায় পড়লেন।

'তাইত রে, তাহ'লে কি হবে! আমি যে তোকে না দেখে থাকতেই পারি নে।

দারুণ বিমর্ষ হ'য়ে ঠাকুর মা-কে জানালেন এই কথা। কিছুক্ষণ পরে হাসতে হাসতে ফিরে এলেন।

যা শালা, আমি তোর কথা শুনবো না। মা বললেন, তুই ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ ব'লে জানিস। তাই ভালবাসিস। যেদিন ওর ভিতর নারায়ণকে না দেখতে পাবি, সেদিন ওর মুখ দেখতেও পারবি নে।

নরেন বললেন, ঠাকুর আমার সব যুক্তি এক কথায় উড়িয়ে দিলেন।

কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষদের নিয়ে ঠাকুর একদিন একত্রে ব'সে আছেন। নরেন্দ্রনাথও সেখানে আছেন।

ঠাকুর ভাবমুখে রয়েছেন। প্রসন্নমনে কেশব আর বিজয়কে দেখতে লাগলেন। পরে নরেন্দ্রকে দেখেই তাঁর ভাবী জীবনের উজ্জ্বল চিত্র তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। এর সঙ্গে কেশব, বিজয় প্রভৃতি লোকদেব পরিণত জীবনের তুলনা ক'রে তিনি পবম স্নেহে নরেন্দ্রকে দেখতে লাগলেন। সভাভঙ্গ হ'লে ঠাকুর বললেন, দেখলাম কেশব একটা শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগদ্বিখ্যাত হয়েছে। নরেন্দ্রের ভিতর অমন ধারা আঠারোটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। আরও দেখলাম, কেশব আর বিজয়ের অন্তর দীপশিখার মত জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল রয়েছে। কিন্তু নরেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে দেখি তার ভিতর জ্ঞানসূর্য উদিত হ'য়ে মায়া মোহের লেশ পর্যন্ত সেখান থেকে দূর ক'রে দিয়েছে।

নরেন এই কথার তীব্র প্রতিবাদ করলেন।

আপনি করেন কি! আপনার এই সব কথা শুনে লোকে আপনাকে পাগল ব'লে মনে করবে। কোথায় জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র ও মহামনা বিজয়কৃষ্ণ আর কোথায় আমার মত একটা স্কুলের নগন্য ছোঁড়া! আপনি ওঁদের সঙ্গে আমার তুলনা ক'রে আর কখনও এমন কথা কইবেন না।

ঠাকুর খুব খুসী হলেন।

কি করব রে, তুই কি ভাবিস, আমি এ সব বলেছি। মা আমায় অমনটি দেখালেন। তা-ই বলেছি। মা-তো আমায় সত্যি ছাড়া মিথ্যে কখনও দেখান নি। তাই বলেছি।

নরেন বললেন, মা দেখিয়ে থাকেন, 'না, আপনার মাথার খেয়ালে ঐসব দেখেন তা' কে বলতে পারে? আমার অমন হ'লে আমি নিশ্চয় মনে করতাম, আমার মাথার খেয়ালেই ঐসব দেখছি। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও দর্শন একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যে, চোখ, কান প্রভৃতি ইন্দ্রিয় আমাদের অনেক সময় প্রতারিত ক'রে থাকে। তা' ছাড়া, বিষয় বিশেষে দর্শনের ইচ্ছা যদি আমাদের মনে সব সময় জাগরিত থাকে, তা' হ'লে তো কথাই নেই। ঐসব আমাদের পদে পদে প্রতারিত করে। আপনি আমায় স্নেহ করেন, ভালবাসেন, সব বিষয়ে বড় দেখতে ইচ্ছে করেন। সেই জন্যেই হয়ত আপনাব ঐরূপ সব দর্শন এসে উপস্থিত হয়।

নরেনের পাণ্ডিত্যে তিনি মুগ্ধ। কিন্তু সাধারণ ভাবভূমিতে থাকা কালে নরেনের তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ যুক্তি ঠাকুবের বাল-স্বভাবের মনকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলল।

তাইতো, কায়মনোবাক্যে সত্যপরায়ণ নরেন তো মিথ্যে বলবার ছেলে নয়। তার মত দৃঢ় সত্যনিষ্ঠ মানুষের মনে সত্যি ছাড়া মিথ্যে সঙ্কল্পের উদয় হতেই পারে না। এ কথা তো শাস্ত্রেও বলছে। তবে কি আমার সব দর্শনের ভুল হবার সম্ভাবনা আছে?

আবার ভাবেন, কিন্তু আমি তো এর আগে নানা রকমে পরীক্ষা ক'রে দেখেছি, মা আমায় সত্যি ছাড়া মিথ্যে কখনও দেখান নি। আর, তাঁর মুখ থেকে আশ্বাসও পেয়েছি। তবে সত্যপ্রাণ নরেন আমার সব দর্শন মাথার খেয়ালে উপস্থিত হয়, এ কথা বলে কেন? কেন বলামাত্র নরেনের মন ঐ সবকে সত্যি ব'লে মনে করে না?

এই ভেবে ঠাকুর মা-কে সব জিজ্ঞাসা করলেন।

মা বললেন, ওর কথা শুনিস কেন? ওর কথা শুনিস কেন? ছাখ্, কিছুদিন পরে ও সব কথাই সত্যি ব'লে মানবে।

মা-র মুখ থেকে এই কথা শুনে ঠাকুর নিশ্চিন্ত হলেন।

একদিন নরেন এসে ঠাকুরকে বললেন, দিনরাত মা মা করেন, মা-কে দেখতে পান আপনি?—জিজ্ঞাসার মধ্যে যেন একটু অবিশ্বাসের স্বর।

দেখতে পাই কিরে! মা-র সঙ্গে ব'সে কথা কই। খাই। মা-র পাশটিতে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোই।

নরেন ঠাট্টা ক'রে বললেন, ঈশ্বরকে দেখা যায় কখনও? কোথায় তিনি?

ওরে, নীচে, উপরে, পিছনে, সামনে, দক্ষিণে, উত্তরে তিনি রয়েছেন যে। অন্তরে বাইরেও তিনি আছেন। দেখবি বই কি! দেখবি বই কি! নিশ্চয়ই দেখবি। তোর এমন চোখ, তুই দেখবি নে?

আরও একদিন ঠাকুর নরেনকে বলেছিলেন, তোকে যেমন দেখছি, তোর সাথে যেমন কথা কইছি, ঠিক এইরূপ ঈশ্বরকে দেখা যায়। তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়। বলি, ঐরূপ করতে চায় কে? লোকে স্ত্রীপুত্রের শোকে ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলে, বিষয় বা টাকার জন্যে ঐরূপ করে, কিন্তু ঈশ্বরকে পেলাম না ব'লে এইরূপ কে করে বল? তাঁকে পেলাম না ব'লে যদি অমন ব্যাকুল হ'য়ে কেউ তাঁকে ডাকে, তাহ'লে তিনি নিশ্চয়ই তাঁকে দেখা দেন।

বাবার মৃত্যুর পর নরেনের সংসার আর চলে না। বহু চেষ্টা ক'রেও নরেন একটা কাজ জোটাতে পারলেন না। সংসারের চিন্তা, মা ভাইদের চিন্তা তাঁকে বিশেষ ভাবে ভাবিয়ে তুলল।

একদিন নরেনের মনে হ'ল, ঠাকুরের কথা তো মা শোনেন। তাঁকে অনুরোধ ক'রে মা-ভাইদের খাওয়া পরার কষ্ট যাতে দূর হয় এমন কিছু করিয়ে নেবেন।

ছুটে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। নাছোড়বান্দা হ'য়ে ঠাকুরকে বললেন, মা-ভাইদের আর্থিক কষ্ট দূর করবার জন্যে মা-কে আপনার জানাতে হবে।

ওরে, আমি যে ওসব কথা বলতে পারি নে। তুই নিজে যা না কেন ? মা-কে মানিস নে, সেই জন্যেই তো এত কষ্ট।

আমি মা-কে জানিনে। আমি আপনাকে জানি। আপনি আমার জন্যে মা-কে বলুন। বলতেই হবে। আমি আজ কিছুতেই আপনাকে ছাড়বো না।

ওরে, তুই মা-কে মানিস নে। সেই জন্যেই তো মা শোনেন না। আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার। আমি বলছি, আজ রাতে কালী ঘরে গিয়ে মা-কে প্রণাম ক'রে তুই যা চাইবি, মা তোকে তা-ই দেবেন। ওরে, মা আমার চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি। ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে কী না করতে পারেন!

নরেনের দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল, ঠাকুর যখন এমন কথা বলছেন, তখন নিশ্চয় প্রার্থনা মাত্রই সব দুঃখের অবসান হবে। প্রবল উৎকণ্ঠায় তিনি রাত্রির প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। রাত্রি হ'ল। এক প্রহর পার হ'লে ঠাকুর তাঁকে মন্দিরে যেতে বললেন।

যা। এইবার মন্দিরে মা-র কাছে যা। গিয়ে যা চাইবি চেয়ে নে। যা। দেরী করিস্ নে।

নরেন মায়ের মন্দিরে এলেন। তিনি দেখলেন, সত্য সত্যই মা চিন্ময়ী সত্য সত্যই মা জীবিতা। ভক্তিতে প্রেমে নরেনের প্রাণ ভ'রে উঠলো। বিহ্বল হ'য়ে বারবার মাকে প্রণাম করলেন। প্রার্থনা করলেন, মা, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও। যাতে তোমার অবাধ দর্শন নিত্য লাভ করতে পারি, এইরূপ করে দাও মা।

পরম শান্তিতে নরেনের প্রাণ আপ্লুত হ'য়ে গেল।

এলেন ঠাকুরের কাছে।

কিরে, মা-র কাছে সংসারের অভাব দূর করবার প্রার্থনা করেছিস্ তো?

না মশায়, ভুলে গেছি।

ঠাকুর বললেন, যা যা, ফের যা। গিয়ে এই কথা জানিয়ে আয়।

নরেন আবার গেলেন। প্রণাম করলেন মাকে।

ঐ একই প্রার্থনা করলেন এবারও।

মা, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও। আমায় তুমি দেখা দাও। মা মা, মা মা!

ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, কিরে এবার বলেছিস্ তো?

না মশায়, মা কে দেখা মাত্র কি এক দৈবী শক্তির প্রভাবে সব কথা ভুলে কেবল জ্ঞান ভক্তি লাভের কথাই বলেছি। কি হবে!

দূর ছোঁড়া, নিজেকে একটু সামলিয়ে নিয়ে ঐ প্রার্থনাটা করতে পারলি নে! পারিস্ তো আর একবার গিয়ে ঐ কথাগুলো জানিয়ে আয়। শীগ্‌গীর যা।

আবার গেলেন নরেন।

একি তুচ্ছ কথা মা-কে বলতে এসেছি! ঠাকুর যে বলেন, রাজার প্রসন্নতা লাভ ক'রে তাঁর কাছে লাউ কুমড়ো ভিক্ষে করা —এ যে সেই রকমই বোকামি! এত হীনবুদ্ধি আমার!

মা মাগো! আর কিছু চাইনে, মা! কেবল জ্ঞান ভক্তি দাও। দেখা দাও। মা, মাগো!

ফিরে এলেন নরেন।

এ নিশ্চয়ই ঠাকুরের খেলা। না হ'লে তিন তিনবার মা-র কাছে এসেও বলা হ'ল না।

এবার ঠাকুরকে ধ'রে বসলেন। আপনিই নিশ্চিত আমায় এইরূপ ভুলিয়ে দিয়েছেন। এখন আপনাকেই বলতে হবে, আমার মা-ভাইদের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব থাকবে না।

ঠাকুর বললেন, ওরে, আমি যে কারও জন্যে ঐসব প্রার্থনা কখনও করতে পারিনে। আমার মুখ দিয়ে ওটা বের হয় না। তোকে বললুম মা-র কাছে যা চাইবি তাই-ই পাবি। তুই চাইতে পারলি নে! তোর অদৃষ্টে সংসার সুখ নেই। তা আমি কি করব!

নরেন বললেন, তা' হবে না, মশায়। আপনাকে আমার জন্যে

ঐ কথা বলতেই হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি বললেই তাদের আর কষ্ট থাকবে না।

আচ্ছা যা, তাদের মোটা ভাত কাপড়ের কখনও অভাব হবে না।

পরদিন ঠাকুর একলা ঘরে ব'সে আছেন। নরেন বাইরে এক পাশে ঘুমিয়ে আছেন।

ঠাকুরের আজ বড় আনন্দ।

এক ভদ্রলোক ঠাকুরকে প্রণাম করা মাত্র তিনি বললেন, ওগো ছাখ, ছেলেটি বড় ভাল। ওর নাম নরেন। আগে মা-কে মানত না। কাল মেনেছে। কষ্টে পড়েছে। তাই মা-র কাছে টাকা কড়ি চাইবার কথা ব'লে দিয়েছিলাম। ত্া' কিন্তু চাইতে পারল না। বলে, লজ্জা করলো। মন্দির থেকে এসে আমায় বলল, মা-র গান শিখিয়ে দাও। 'মা ত্বং হি তারা' গানটি শিখিয়ে দিলাম। কাল সারা রাত্ত নরেন ঐ গানটা গেয়েছে। এখন ঘুমুচ্ছে।

আহ্লাদে হাসতে হাসতে বললেন, নরেন কালী মেনেছে। বেশ হয়েছে। না?

আবার বললেন, নরেন মা-কে মেনেছে। বেশ হয়েছে। কেমন?

এই একই কথা বার বার বলতে লাগলেন। নরেন মা-কে মেনেছে। নরেন মা-কে মেনেছে।

বাবুরাম ঘোষ।

যিনি পরে স্বামী প্রেমানন্দ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। সেই বাবুরাম।

এক রাতে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে তিনি এক ঘরে শুয়ে আছেন।

কিসের শব্দে বাবুরামের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি শুনতে পেলেন যেন কার পায়ের শব্দ। শেষে দেখলেন, পরণের কাপড় বগলের নীচে গুটিয়ে নিয়ে ঠাকুর অস্থির হ'য়ে ঘরে পাইচারি করছেন।

উত্তেজিত হ'য়ে তিনি বলছেন, ও সব আমি চাইনে। ও সব তুই ফিরিয়ে নিয়ে যা। ছিঃ, ঐ সব দিয়ে আমার কী হবে!

বাবুরাম অবাক হ'য়ে শুনলেন এই কথা।

আবার পাইচারি করতে লাগলেন ঠাকুর। আবার একই কথা। ওসব আমি চাইনে। ওসব তুই ফিরিয়ে নিয়ে যা। ওসব দিয়ে আমার কী হবে! ছিঃ!

কিছুক্ষণ বাদে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন ঠাকুর।

বাবুরাম জিজ্ঞাসা করলেন, তখন ওবকম করছিলেন কেন?

ওঃ, দেখে ফেলেছিস্ নাকি? মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে যেতে দেখি, ঘরে মা এসেছেন। হাতে একটা থলে। মা বললেন, এই থলের মধ্যে যা' কিছু আছে সব তোর। তোর জন্যেই এনেছি। নে, হাত পাত।

কি এনেছিস্?

তাকিয়ে দেখি থলের মধ্যে নাম, যশ, লোকমান্য। থলে থেকে মুখ বের ক'রে রয়েছে। উঃ! সে কী বীভৎস দেখতে! তখন চেঁচিয়ে উঠলাম, তুই ও সব ফিরিয়ে নিয়ে যা! ফিরিয়ে নিয়ে যা! আমি ও সব চাইনে! আমাকে লোভ দেখাস্ নে! তোর পায়ে পড়ি, মা! তোর পায়ে পড়ি! তারপর, তারপর আর কি? মা একটু হাসলেন। চলে গেলেন থলে নিয়ে।

হলধারী ঠাকুরের নিকট আত্মীয়। তিনিও মন্দিরের একজন পূজারী। তিনি জ্ঞানমার্গের লোক।

একদিন তিনি ঠাকুরকে বললেন,

ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে ভাবাতীত, নামরূপাদি উপাধিবর্জিত। ভাব আর ভক্তির সাহায্যে তাঁর সম্বন্ধে যে সব অনুভূতি হয়, তা মিথ্যে।

ঠাকুর নিজ মুখে বলেছেন, ভাবলাম তবে তো ভাবাবেশে যত কিছু ঈশ্বরীয় রূপ দেখেছি, আদেশ পেয়েছি, সে সবই ভুল। মা-তো তবে আমায় ফাঁকি দিয়েছে। মন বড়ই ব্যাকুল হ'ল। অভিমানে

কাঁদতে লাগলাম। সে কান্নার তোড় আর থামে না। ঘরে ব'সে কাঁদছিলাম। শেষে কাঁদতে কাঁদতেই ছুটে গেলাম মা-র কাছে।

মাগো, নিরক্ষর মুখ্খু ব'লে আমায় কি এমনি ক'রে ফাঁকি দিতে হয়?

কান্নায় ফেটে পড়লেন ঠাকুর।

অকস্মাৎ সামনের মেঝে থেকে কুয়াশার ধোঁয়ার মত কি যেন উঠতে লাগলো। তার মধ্য থেকে আবির্ভূত হ'ল এক দিব্য পুরুষ। আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রু তাঁর। গৌরবর্ণ জীবন্ত সৌম্যমুখ। তিনি ঠাকুরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ওরে তুই ভাবমুখে থাক, ভাবমুখে থাক।

এই কথা ব'লে দিব্যমূর্তি তিরোহিত হলেন।

একদিন কথায় কথায় হলধারী কালীমূর্তিকে তমোগুণময়ী বা তামসী ব'লে ধারণা করেছিলেন। তিনি ঠাকুরকে এই কথা ব'লেই ফেললেন।

তামসী মূর্তির উপাসনায় কখনও আধ্যাত্মিক উন্নতি হ'তে পারে না। তুমি ঐ-দেবীর আরাধনা কর কেন?

ঠাকুর এই কথা শুনে হলধারীকে কিছুই বললেন না। মা-র নিন্দা শুনে তাঁর অন্তর ব্যথিত হ'ল। চ'লে গেলেন মা-র মন্দিরে।

মা, হলধারী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। সে তোকে তমোগুণময়ী বলে। তুই কি সত্যি তাই?

মা ঠিক ঠিক বুঝিয়ে দিলেন ঠাকুরকে।

মা-র মুখে সব শুনে উল্লাসে উৎসাহিত হয়ে ঠাকুর ছুটে গেলেন হলধারীর কাছে। একেবারে চেপে বসলেন তাঁর ঘাড়ে। উত্তেজিত হয়ে বার বার বলতে লাগলেন, তুই মা-কে তামসী বলিস্? মা কি তামসী? মা যে ত্রিগুণময়ী আবার শুদ্ধসত্ত্ব গুণময়ী।

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের এই কথায় ও তাঁর স্পর্শে হলধারীর অন্তরের চোখ প্রস্ফুটিত হ'লো। তিনি ঠাকুরের ঐ কথা অন্তরের সঙ্গে স্বীকার

করলেন। তাঁর ভিতর সাক্ষাৎ জগদম্বার আবির্ভাব হয়েছে মনে ক'রে ফুল চন্দন দিয়ে তাঁকে পূজো করতে লাগলেন।

হৃদয় বললেন, মামা, এই তুমি বল, রামকৃষ্ণকে ভূতে পেয়েছে। তবে আবার তাকে পূজো করলে কেন ?

হলধারী বললেন, কি জানি হৃদু। কালীঘর হ'তে ফিরে এসে সে আমায় কি যে একরকম ক'রে দিলে, আমি সব ভুলে তার ভিতরে সাক্ষাৎ ঈশ্বর প্রকাশ দেখতে পেলাম। কালীমন্দিরে যখনই আমি রামকৃষ্ণের কাছে যাই, তখনই আমাকে অমনধারা ক'রে দেয়। এ এক মজার ব্যাপার। কিছুই বুঝতে পারিনে।

ঠাকুরের ব্যাধি ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

সেদিন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামনি ঠাকুরকে দেখতে এসেছেন। তিনি বললেন, আচ্ছা, আপনার মত লোক তো ইচ্ছা মাত্রই এই ব্যাধি দূব ক'বে দিতে পারে' তা হলে একবার তা করুন না।

সে কি গো। তুমি পণ্ডিত হ'য়ে, এ কথা কি ক'রে বলছো ? যে মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, সেখান থেকে তুলে এনে এই ভাঙ্গা হাড় মাংসের খাঁচাটায় রাখতে কি প্রবৃত্তি হয় ?

পণ্ডিতের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুলো না। তিনি মনে করলেন, সত্যিই ইনি দেবতা।

কিন্তু ভক্তদের যে এড়ানো দায়।

নরেন ও অন্যান্য গুরু ভাইরা বারবার চাপ দিতে লাগলেন। তাঁরা বললেন, অন্তত আমাদের জন্যে আপনাকে এ রোগ সারাতেই হবে। আপনি নিজে কিছু করতে না চান, মা কে তো বলতে পারেন।

অগত্যা ঠাকুবকে রাজী হ'তে হ'ল।

সবাই কি হয় জানবার জন্যে উৎসুক রইলেন।

নরেন এসে বললেন, মা-কে বলেছেন তো ? কি জবাব পেলেন, বলুন ?

মা-কে বললাম, মা, গলার এই ক্ষতের জন্যে খেতে পারিনে যাতে দুটি খেতে পারি, তাই ক'রে দে। তা' মা তোদের সবাইকে দেখিয়ে বললেন, কেন এই যে এত মুখে খাচ্ছিস্।

এর পর ভক্তরা আর তাঁকে এ-বিষয় কিছু বলেন নি। কী আর বলবেন!

ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের আর দেরী নেই।

ঠাকুর সেদিন নরেনকে নিজের ঘরে ডাকিয়ে আনলেন। আর কেউ নেই সেখানে। স্থির দৃষ্টিতে নরেনের দিকে চেয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে তিনি সমাধিমগ্ন হ'য়ে পড়লেন।

নরেনেরও তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থা।

জ্ঞান ফিরে এলে নরেন দেখলেন, ঠাকুর তাঁর দিকে চেয়ে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করছেন।

আজ তোকে সর্বস্ব দিয়ে আমি ফকীর হলুম। এই শক্তিতে তুই অনেক কাজ করবি। তার পরে ফিরে যাবি।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট। ঠিক মধ্যাহ্নের কিছু আগে যোগমগ্ন অবস্থায় ঠাকুর চিব-নিদ্রায় নিদ্রিত হ'লেন।

স্থায়ী আসন ক'রে নিলেন তিনি ভবতারিণীর কোলে।

মায়ের কোলে কামারপুকুরের গদাধর।

বিশ্বময়ীর কোলে বিশ্বমোহন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

রামলালা

দক্ষিণেশ্বর।

এ যুগের শ্রেষ্ঠ তীর্থ দক্ষিণেশ্বর।

দক্ষিণেশ্বরের এক আকর্ষণ তীর্থ-দেবতা ভবতারিণী।

আর, অন্য আকর্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

প্রথম জীবনের নাম গদাধর। গদাধর চট্টোপাধ্যায়।

জগতে প্রচলিত সকল প্রকার ধর্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ফলে শ্রীরামকৃষ্ণ এই পরম সত্যেই পৌঁছেছিলেন—সব ধর্মই সত্য—যত মত, তত পথ মাত্র।

সর্বধর্মসমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাস্থল এই দক্ষিণেশ্বর।

চুম্বক টানে যেমন লোহাকে, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ টেনে আনতেন দেশের শ্রেষ্ঠ সাধকদেব দক্ষিণেশ্বরে। আনতেন নিজের কাছে। তাঁদের সবাব সাথে তিনি আলাপ করতেন, তত্ত্বকথা কইতেন। নিজের মতকে যাচাই ক'রে দেখতেন।

এক সময়ে গদাধর রামাইত সাধনে নিমগ্ন হলেন। তখন তাঁর

'দিবানিশি এক চিন্তা কোথা রঘুবীর।'

শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ধ্যান; শ্রীরামচন্দ্র তাঁর জ্ঞান। শ্রীরামচন্দ্রই তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত ধন। চোখের সামনে আর কিছুই দেখেন না। দেখেন শুধু নবদূর্বাদল-শ্যাম শ্রীরামচন্দ্রকে। কণ্ঠে শুধু রাম নাম। রাম রাম, রাম রাম। রাম নাম উচ্চারণ করেন, আর, দুই চোখ বেয়ে জলধারা নামে।

এমনি অবস্থার মধ্যে জটাধারী একদিন দক্ষিণেশ্বরে এলেন।

জটাধারী হলেন একজন রামাইত সম্প্রদায়ের সাধক। মহা সাধক। সর্বক্ষণই তাঁর রামভাবে মন।

গদাধর তাঁকে খুঁজে বের করলেন অতিথিশালা থেকে।

জটাধারী বালরামচন্দ্র মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে অষ্টপ্রহরের সঙ্গী রামলালা।

রামলালা হলেন বালক রামচন্দ্রের বিগ্রহমূর্তি। অষ্ট ধাতু দিয়ে তৈরী। জটাধারী আদর করে ডাকেন রামলালা।

'সাধুর সোহাগে রাখা রামলালা নাম।
সেই সে সাধুর ছিল ধন মন প্রাণ।'

আর কোনও দিকেই খেয়াল নেই জটাধারীর। সারাটি ক্ষণ থাকেন রামলালাকে নিয়ে। যেখানেই যাবেন সঙ্গে রামলালা। ভিক্ষে করে মিললো কিছু। বেঁধে-বেড়ে আগে খাওয়াবেন রামলালাকে। রামলালা একদণ্ডের জন্যেও চোখের আঁড়াল হ'লে জগৎ আঁধার দেখেন তিনি। তাকে আদর করেন, যত্ন করেন। তার সঙ্গে খেলা করেন। তাকে গল্প বলে শোনান। তার সঙ্গে কত কথা কন তিনি! আবার, দুষ্টুমি করলে ধমকে দিতেও ছাড়েন না।

বামলালাও জটাধারীর সঙ্গে

'খায় দায় কাছে থাকে করে নানা খেলা।'

রামলালা নাকি কথা কয় জটাধাবীর সঙ্গে। একবার কথা কইতে শুরু করলে তার মুখে খই ফোটে। কথা আর ফুরোতেই চায় না। রামলালা নাকি হাসে। ফিক ফিক কবে হাসে। মাঝে মাঝে সে নাকি বড়ই অভিমান করে। তার তখন মুখ ভারী হয়। আবার দুরন্তপনারও কি সীমা আছে! প্রায়ই জটাধারীকে জ্বালাতন ক'রে, অস্থির কবে তোলে।

অন্য লোকেব কাছে রামলালা একটি বিগ্রহ—অষ্টধাতু দিয়ে তৈরী বিগ্রহ। কিন্তু জটাধারীর কাছে? জটাধারীর কাছে এটি বিগ্রহ নয় -রামলালা। বড় আদরের রামলালা। কৌশল্যার কাছে যেমন ছিলেন রাম, যশোমতীর কাছে যেমন ছিলেন কানাই, শচীদেবীর কাছে যেমন নিমাই, ঠিক তেমনই জটাধারীর কাছে রামলালা, প্রাণপ্রিয় রামলালা।

কয়েকদিন যেতে না যেতেই গদাধর স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, রামলালার টান পড়েছে তাঁর পরে। তিনি দেখেন রামলালাকে। তাঁর চোখ আর অন্যদিকে ফেরে না। দেখেন, রামলালা তাঁর 'পদ্মপলাশের মত আঁখি ছুটি দিয়ে' তাঁরই দিকে তাকিয়ে থাকে। তাঁকে দেখে আর হাসে। হাসে আর দেখে।

আরও কিছুদিন যায়।

বড় আনন্দের মধ্য দিয়েই গদাধরের দিন কাটতে লাগলো। বুঝিবা রামলালারও।

এরই মধ্যে

'পাকিয়া পিরীত উঠে গেল এত দূর।
প্রভুর ছাওয়াল হৈল সাধুর ঠাকুর।'

রামলালা হ'য়ে পড়লেন যেন গদাধরের পুত্র। আদরের তুলাল।

গদাধর পরিষ্কার বুঝতে পারেন, তিনি যতক্ষণ থাকেন জটাধারীর সঙ্গে ততক্ষণ রামলালা বেশ থাকে, সবই ঠিক। সে খায়-দায়, খেলা করে। হাঁপিয়ে গেলে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু যেই না তিনি ঘরপানে রওনা হলেন, অমনি রামলালা তাঁর পিছু পিছু চলতে শুরু করে।

এই, আমার পিছু পিছু আসছিস যে। কোথায় যাবি? যা, যা বলছি। ফিরে যা এখুনি যা। ওখানে রয়েছে তোর জটাধারী। তার কাছে যা। আচ্ছা ক'রে ধমকে দেন গদাধর।

বড় তুষ্টু ছেলে তো! কথা কানেই ঢুকছে না।......

এ্যাঁ, আবার নাচন শুরু হ'ল।

কখনও গদাধরের সুমুখে, কখনও পিছু পিছু, নাচতে নাচতে চলেছে রামলালা।

নূপুরের শব্দ গদাধর স্পষ্ট শুনতে পান।—রিণিকি রিণি, রিণিকি রিণি!.. ...

রাগ নিমেষে জল হ'য়ে যায়।

গদাধর সুর ধরেন—

নাচে নাচে। নাচে নাচে।

'ঠমকি চলত রামচন্দ্র বাজত পৈঁজনিয়া।……'

মাঝে মাঝে গদাধরের কেমন যেন খটকা লাগে। রামলালা জটাধারীকে ছেড়ে আমার কাছে থাকতে চায় কেন! জটাধারী যে কায়ে মনে বাক্যে রামলালাকে সেবা ক'রে চলেছে। রামলালা যে ওর জীবন-সর্বস্ব ধন। ওকে যে জটাধারী প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তবে আমি কি ক'রে জটাধারীর চেয়ে রামলালার আপন হবো! এ কেমন হচ্ছে! তাইতো! এ সব আমার চোখের ভুল নয় তো! এ'সব ঠিক দেখছি তো! আচ্ছা, যদি ঠিকই না দেখব, তবে এই লোকজন, বাড়ীঘর, এই গঙ্গা, ওই গাছপালা, ওই পঞ্চবটিতলা, এসব দেখাও মিথ্যে। মিথ্যে আমার মা-কে দেখা! শিউরে ওঠেন গদাধর। না না না, তা' হতেই পারে না। আমার মা-কে দেখা কখনও মিথ্যে হতে পারে না। পারেই না। আর, তা' যখন মিথ্যে নয়, তখন কেন মিথ্যে হবে রামলালার এই সব আদর-আবদার, চাল-চলন, নাচা-গাওয়া!

এই সারলো! কাণ্ডখানা দেখ একবার!

দুই হাত তুলে রামলালা বলছে, আমায় কোলে কর। আমায় কোলে কর।

আবদার দেখ না!

কিছুতেই ছাড়বে না। কোলে করতে হ'ল রামলালাকে।

কেমন, হ'ল তো? বলি, হ'ল তো?

একদিন রামলালা গদাধরের কোলে দিব্যি শান্তশিষ্ট লক্ষ্মী ছেলেটির মতো ব'সে রয়েছে।

এর মধ্যেই শুরু হ'ল দুরন্তপনা। কোল থেকে নেমেই দৌড়তে শুরু কোরলো।

ওরে, যাসনি, যাসনি। অমন করিসনি। বড় রোদ। গরমে ফোস্কা পড়বে পায়ে।

—ইঃ, মুখ ভেংচান হচ্ছে! খবরদার! মুখ ভেংচাবি নে বলছি!

একদিন হ'ল কি।—

কোল থেকে নেমেই, দে ছুট। সোজা গিয়ে রামলালা ঢুকল কাঁটাবনে।

ফুল তুলবো।

ওরে, ও রামলালা! আয়, এদিকে আয়। হাতে পায়ে সর্বাঙ্গে কাঁটা ফুটবে। রক্ত বেরুবে। ব্যথা পাবি। ফিরে আয়, ফিরে আয়। আমি ফুল তুলে দেবো তোকে। অনেক ফুল। এক গাদা ফুল।

একদিন চান করবার সময়ে গঙ্গায় নেমে ঝাঁপাঝাপি! জল থেকে আর উঠবেই না। সে কী ঝাঁপাঝাপি!

ওরে, এতক্ষণ জল ঘাঁটিসনি। ঠাণ্ডা লাগবে। সর্দি হবে। জ্বর হবে।

কে শোনে কার কথা! যেন কে কাকে বলছে!

দূরে দাঁড়িয়ে গদাধরের দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসতে লাগলো।

হাসা হচ্ছে! তবে রে পাজি ছেলে! রোস। আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। মেরে তোর হাড় গুঁড়ো করে দেবো।

ধরতে গেলেন রামলালাকে। রামলালা দৌড়ে পালিয়ে গেল। গদাধরও পিছু পিছু ছুটতে লাগলেন।

ওরে, আমি কি তোর সাথে পারিবে! আয়, লক্ষ্মীটি আমার! ধন আমার! মাণিক আমার! আয় আয়!

একদিন গঙ্গায় ঝাঁপ দিলো রামলালা। সঙ্গে সঙ্গে গদাধরও ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ছাড়বার পাত্রটি তিনি নন। ধ'রে ফেললেন

রামলালাকে। আনলেন টেনে উঠিয়ে ডাঙ্গায়। নানা খেলনা দিয়ে ভোলাতে লাগলেন।

লক্ষ্মীটি আমার! জল না হ'লে কি আর খেলা হয় না? কেন, ঘরে ব'সে খেলা যায় না? আয়, আমি তোর সাথে খেলছি।

কথা শুনবেই না। আবার যেতে চায় গঙ্গায়।

আমি গঙ্গায় খেলা করবো। সাঁতার কাটবো।

বটে? এখনও তোমার দুষ্টুমি?

রেগে এক থাপ্পড় মারলেন রামলালার মুখে।

মুখখানি ভার ক'রে, লাল ঠোঁট দুখানি ফুলিয়ে, চোখ দুটি থেকে মুক্তোর পর মুক্তো গড়িয়ে দিতে লাগলো রামলালা।

গদাধর কি আর থাকতে পারেন! বুকের মধ্যে যেন গামছা নিংড়োতে লাগলো কেউ।

আয়। তোকে আর কিছুই বলবো না। কিছুই বলবো না। কত আদর করলেন রামলালাকে। চুমু খেলেন। কত মিঠে কথা বললেন।

গদাধর চান করতে চলেছেন গঙ্গায়। দেখেন পিছু পিছু আসছে রামলালা।

আমিও তোমার সাথে চান করবো।

তা বেশ তো! চল না।

সবারই নাওয়া হ'ল। রামলালার আর হয় না। সে উঠতেই চায় না জল থেকে।

আরে ওঠ, ওঠ।

কে শোনে কার কথা!

গদাধরের বড়ই রাগ হ'ল। তবে নে, কত জল ঘাঁটতে চাস, ঘাঁট। চুবিয়ে ধরলেন রামলালাকে জলের মধ্যে।

কেমন! চান কর এইবার। যত খুশী চান কর।

নিমেষেই গদাধর বুঝতে পারলেন, রামলালা জলের নীচে হাঁপিয়ে শিউরে উঠছে। তাঁর যেন দম বন্ধ হবার উপক্রম। ছটফট করছে।

তার কষ্ট দেখে তৎক্ষণাৎ রামলালাকে বুকে করে উঠিয়ে নিয়ে এলেন ডাঙায়।

একদিন হ'ল কি।—

সেদিন দুরন্তপনার আর অবধি নেই। কিছুতেই রামলালাকে আর শান্ত করতে পারছেন না গদাধর। ভোলাবার জন্যে তিনি রামলালাকে খই খেতে দিলেন।

খাও। এই খই খাও। ভালো খই। খাও।

রামলালা খই খেতে লাগলো।

এদিকে হয়েছে কি! গদাধর লক্ষ্য করেন নি যে, সেই খইয়ের ভিতর ধান ছিল। ধান সমেত সেই খই খেতে গিয়ে রামলালার নরম তুলতুলে জিভ চিরে গিয়েছে। গদাধর দেখলেন তা স্পষ্ট।

গদাধরেব বুক ফেটে গেল। কেঁদে উঠলেন তিনি। চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন। যে মুখে মা কৌশল্যা লাগবে বলে ক্ষীর সর ননীও অতি সন্তর্পণে তুলে ধরতেন, সেই মুখে এই কদর্য খাবার দিতে মনে একটুও সংকোচ হ'ল না!

সে কান্না কি আর থামে! যে আসে সেই দেখে গদাধর শোকে অধীর হয়ে কাঁদছেন।

ব্যাপার কি!

আমার রামলালার জিভ ধানে চিরে গিয়েছে। ওগো, তোমরা ছাখ না। কি হবে। কি করি এখন!

যে যেখানে ছিলেন, ছুটে এলেন। গদাধরের আর্তনাদ শুনে সবারই চোখে জল এলো। রামলালার সঙ্গে গদাধরের প্রেম-সম্বন্ধের বিন্দু-বিসর্গ বুঝতে না পারলেও গদাধরের আর্তনাদ শুনে সবাই শোকে অধীর হয়ে পড়লেন।

জটাধারীর রান্না শেষ হয়েছে। রামলালা খাবে। জটাধারীও খাবেন। ঢের বেলা হয়ে গিয়েছে।

রামলালা, ও রামলালা!

কিন্তু কোথায় রামলালা! খুঁজতে লাগলেন। চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন। রামলালা ও রামলালা! খাবি আয়!

খুঁজতে খুঁজতে পেলেন রামলালাকে গদাধরের কাছে। দিব্যি গল্প করছে দুইজনে। জটাধারীর ডাক কানে যাবে কি ক'রে?

বড় রাগ হ'ল। অভিমানও হ'ল।

কেমন ছেলে তুই! আমি এত ক'রে রেঁধে-বেড়ে তোকে খাওয়াব ব'লে খুঁজে বেড়াচ্ছি, চেঁচিয়ে মরছি! তুই কিনা নিশ্চিন্ত হ'য়ে সব ভুলে এখানে এসে গল্প করছিস!

চল, চল আমার সঙ্গে।

জোর ক'রে ধরে নিয়ে গেলেন জটাধারী।

তোকে আমি চিনেছি রে, তোকে আমি খুব চিনেছি। চিরটা কাল তুই এমন ধারা। দয়া মায়া, এসব কি তোর শরীরে লেশমাত্র আছে? মোটেই না। মোটেই না। বাপ-মাকে ছেড়ে বনে চ'লে গেলি। কেঁদে কেঁদে বুড়ো বাপটা মরেই গেল। মা কৌশল্যা কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হবার উপক্রম। তবুও তুই কি এলি একটিবার চোখের দেখা দিতে? কঠিন পাষাণ তুই!

জটাধারী রইলেন দক্ষিণশ্বরে বেশ কয়েক দিন। দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে যেতে তাঁর মন আর চায় না।

রামলালা গদাধরকে ছেড়ে যাবে না। আর, জটাধারীও বা চিরকালের আদরের ধন রামলালাকে ফেলে যাবেন কি করে?

সেদিন জটাধারী পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, গদাধরের কাছে থাকতেই রামলালা ভালবাসে। সুখ পায়। পায় শান্তি। তাঁর কাছেই ওর বেশী আনন্দ।

জটাধারী এলেন গদাধরের কাছে।

ভারী গলায় সজল চোখে তিনি বললেন, রামলালা আমাকে বহুত কৃপা করেছে। যেমনভাবে যখনই দেখতে চেয়েছি, তখনই ঠিক তেমনি ভাবেই দেখা দিয়েছে। প্রাণের পিপাসা মিটিয়ে দেখেছি তাকে। আজ রামলালা আমাকে ব'লে দিয়েছে, এখান থেকে, তোমার কাছ ছেড়ে, কিছুতেই ও যাবে না। আমার মনে আজ আর দুঃখ কষ্ট নেই। তোমার কাছেই ও থাকবে। তোমার কাছে থেকে ও সুখ পাবে, আনন্দে খেলাধুলা করবে। তা দেখেই আমি আনন্দ পাবো। বিভোব হ'য়ে থাকবো আনন্দে। আজ আমি বুঝতে পেরেছি, ওর সুখেই আমার সুখ। ওর আনন্দেই আমার আনন্দ। তাই আমি এখন আমাব রামলালাকে তোমার কাছে রেঁখে যেতে পারবো। তোমার কাছে সুখে আছে এই ভেবে যতদিন বাঁচব আনন্দই পাব। আমি এখন আসি।

আজ জটাধাবী বুঝেছেন, তাঁর রামলালা তাঁর কাছেই সর্বক্ষণ আছেন। যখনই ইচ্ছা তাঁর দর্শন পাবেন। যেখানেই তিনি থাকুন না কেন, সেখানেই তাঁর দর্শন পাবেন।

আজ জটাধারীর আনন্দ। আজ তিনি প্রেমে বিভোর। যে প্রেমে স্বার্থের লেশমাত্র নেই সেই প্রেমে। যে প্রেমে প্রেমাস্পদের সঙ্গে আর বিচ্ছেদের আশঙ্কা নেই সেই প্রেমে।

জটাধারীর আনন্দের আর পরিসীমা নেই।

গদাধরেরও আনন্দের অবধি নেই।

দুজনেই বিভোর। আনন্দে বিভোর।

জটাধারী ও গদাধর।

রামলালাকে গদাধরের হাতে সমর্পণ ক'রে জটাধারী দক্ষিণেশ্বর থেকে বিদায় নিলেন।

সারদামণি ও তাঁর বোন

জয়রামবাটি।

এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন শ্রীসারদামণি। জয়রামবাটি সারদামণির পিত্রালয়।

সারদামণি হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী।

তখন শ্রীরামকৃষ্ণ থাকেন দক্ষিণেশ্বরে।

সারদামণি জয়রামবাটিতে।

চার বছর হ'য়ে গেছে। সেই কামারপুকুরে স্বামীকে দেখেছেন। তারপর আর দেখা হয়নি।

সেবার শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মণী ও ভাগনে হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে কামারপুকুরে এসে বেশ কয়েকদিন ছিলেন। রামকৃষ্ণের লোকজনেরা জয়রামবাটি থেকে সারদামণিকে নিয়ে এলেন। তাঁর তখন বয়স কতই-বা— চৌদ্দ হবে। এখন অবশ্য আঠারো।

সেই স্বামী সন্দর্শনের কথা এখনও তাঁর মনে আছে। বেশ মনে আছে সেই অনির্বচনীয় আনন্দের দিনগুলির কথা। পরে তিনি নিজমুখে এই আনন্দের আভাষ দিয়েছিলেন।

'হৃদয়ের মধ্যে আনন্দের পূর্ণ ঘট যেন পাতা রয়েছে। তখন সর্বদাই এইরূপ মনে হোতো। সেই ধীর স্থির দিব্য আনন্দে অন্তর কতদূর কিরূপ ভরা থাকত তা' ব'লে বুঝাবার নয়।'

হ্যাঁ, এরই ফলে বুঝিবা তিনি চপলা না হ'য়ে হয়েছিলেন শান্তস্বভাবের। প্রগল্‌ভা না হ'য়ে হয়েছিলেন চিন্তাশীলা।

জয়রামবাটির কেউ কলকাতায় এলে দক্ষিণেশ্বরে যান। দেখেন মায়ের মন্দির আর মন্দির-অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভবতারিণীকে। আর, দেখা করেন গাঁয়ের জামাই গদাধরের সঙ্গে।

এই গদাধরই হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

তাঁরা গ্রামে ফিরে গিয়ে বলাবলি করেন, জামাই-এর কেমন যেন পাগল পাগল ভাব। সবার মুখে এক কথা।

কেউ বলেন, গদাধর পাগল হ'য়ে গিয়েছে।

কেউ বলেন, পবণের কাপড়খানি পর্যন্ত তার ঠিক থাকে না। কাপড় খুলে হরি হরি ক'রে বেড়ায়।

হযত বা কোনও সমবয়স্কা স্ত্রীলোক সারদামণিকে পাগলের বউ ব'লে উপহাস কবে, হয়ত বা কেউ সমবেদনা জানায়।

সাবদামণি অস্থিব, উন্মনা হ'য়ে পড়েন

তবে কি আব তেমনটি নেই? লোকে যেমন যেমন বলছে, তাঁর কি সত্যি তেমনই অবস্থা? আর, বিধাতার যদি তাই ই ইচ্ছা হয়, তবে তো কালবিলম্ব না ক'রে এখুনি তাঁর পাশে গিয়ে তাঁর সেবা করা কর্তব্য। তাই যাই। যাই দক্ষিণেশ্বরে। গিয়ে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করি। পরে যথা কর্তব্য করা যাবে।

দোল পূর্ণিমা আসন্ন।

এই দিনে জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। বাঙালী হিন্দুর কাছে এই দিনটি বড় শুভ দিন, পুণ্য দিন। অনেকেই এই দিনে গঙ্গা স্নান ক'রে পুণ্য সঞ্চয় করেন।

সারদামণি টের পেলেন, তাঁদের দূর সম্পর্কের কয়েকজন আত্মীয়া গঙ্গাস্নান করতে যাবেন।

ভাবলেন, এই তো সুযোগ এসে গিয়েছে। এঁদের সঙ্গে যেতে পারতাম, দেখা হোতো তাঁর সঙ্গে।

ইচ্ছে হ'লেই তো হয় না। কেমন ক'রে প্রকাশ করেন মনের এই অভিলাষ? সংকোচ আসে। লজ্জা হয়। হাজার হোক, বাঙালী ঘরের বধূ। থাকুন না তিনি বাপের বাড়ীতে।

যে ক'রেই হোক কথাটা টের পেলেন বাবা রামচন্দ্র। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁরও ইচ্ছা, জামাইকে গিয়ে দেখে আসি।

তিনি সানন্দে রাজী হলেন। বললেন, আমিই নিয়ে যাবো মেয়েকে জামাই-এর কাছে।

কিন্তু দক্ষিণেশ্বর কি এখানে? সে বহু ক্রোশ দূরে। তখন এদিকে রেলপথ চালু হয়নি। বিষ্ণুপুর, তারকেশ্বর, ঘাটাল প্রভৃতি জায়গার সাথে রেলপথের যোগাযোগ নেই। লোকে যাতায়াত করত হয় পদব্রজে না হয় পালকীতে চ'ড়ে। কিন্তু পালকীতে যাওয়া কি চারটিখানি কথা? বহু টাকার দরকার। কোথায় জয়রামবাটি আর কোথায় দক্ষিণেশ্বর! মধ্যবিত্ত বা গরীব গৃহস্থের পক্ষে পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। তাই সই।

সবাই পায়ে হেঁটে রওনা হ'লেন।

বাবা রামচন্দ্র, মেয়ে সারদামণি আর তাঁর সঙ্গিনীরা।

পায়ে হাঁটা পথ। তা-ও কি যে সে পথ! বহু জায়গায় মেঠো জনবিরল পথ। ক্রোশের পর ক্রোশ গেলেও গাছের ছায়া মিলবে না। দৈবাৎ একটা পুকুর মিললো, আশে পাশে হয়ত বা কয়েকটা তালগাছ। সেখানেই হাতমুখ ধুয়ে গাছের নীচে ব'সে কিছু সময় বিশ্রাম করা চলে। তারপর আবার চলা।

প্রথম দুই তিন দিন আনন্দের সঙ্গেই চললেন সারদামণি। কিন্তু সে আনন্দ আর রইল না। দীর্ঘপথ পায়ে হাঁটা তো অভ্যাস হয়নি। নিদারুণ পথশ্রমে কাতর হ'য়ে পড়লেন। কড়া রোদে মুখখানি তাঁর ঝল্‌সে গিয়েছে। পা যেন আর চলে না। শরীর যেন অবসন্ন হ'য়ে আসে। মন্ বলছে—না, আর একটু হাঁটি। তার পরে বিশ্রাম নেবো।

মাঝে মাঝে পিছন ফিরে রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, খুব কষ্ট হ'চ্ছে —না, মা?

না, বাবা।

তখন সারদামণির পা দুখানি আবার দ্রুত চলে।

এমনি ক'রেই তাঁরা চলেছেন। বাপ, মেয়ে আর তাঁর সঙ্গিনীরা।

এর মধ্যে হঠাৎ জ্বর এলো সারদামণির। মাঝপথেই দারুণ জ্বর।

মহাভাবনায় পড়লেন রামচন্দ্র। না যায় ফেরা এদিক। না যায় যাওয়া ওদিক।

সঙ্গিনীরা আর অপেক্ষা করতে রাজী হলেন না। পেরিয়ে যাবে যোগের ক্ষণ। তাঁরা সবাই গেলেন চ'লে। রইলেন মাত্র দুইজন—রামচন্দ্র আর সারদামণি।

একজনের মহাভাবনা। আশে পাশে লোকজন বেশী নেই। ডাক্তার বদ্দি মিলবার সম্ভাবনা নেই।

অন্য জনার জ্বর। জ্বরে দেহ অবসন্ন।

খোঁজ নিয়ে জানলেন নিকটেই একটা চটি আছে।

কোনও প্রকারে রামচন্দ্র সারদামণিকে নিয়ে উপস্থিত হ লেন সেই চটিতে।

কতকটা যেন নিশ্চিন্ত হ'লেন রামচন্দ্র। তবু যা হোক্ একটা আশ্রয় মিললো।

সাবদাম'ণির দুঃখের আর অবধি নেই। এত কষ্ট ক'রে এলাম! দেখা হবে না? যেতে পারবো না দক্ষিণেশ্বরে? আমার অদৃষ্ট!

বেশীক্ষণ ভাবতে পারেন না। লজ্জা সরম রহিত হ'য়ে সারদামণি বেহুঁশ হ'য়ে প'ড়ে রইলেন।

এমন অবস্থায় সারদামণি দেখলেন, একটি শ্যাম বর্ণের মেয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে এলো তাঁরই সম্মুখে। কালো হ'লে কি হবে! এত

রূপ কি আর দেখেছেন সারদামণি ? ত্রি-জগৎ মোহিত করা রূপ ! তিনি মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইলেন। চোখের পলক যেন পড়ে না।

আহা !,

মেয়েটি এসে তাঁর পাশে বিছানায় বসল। ধীরে ধীরে গায়ে মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

এমন নরম ঠাণ্ডা হাত ! গায়ের জ্বালা যেন নিমেষে জুড়িয়ে গেল !

আহা !

সম্বিৎ কতকটা ফিরে এলো। সারদামণির নজর পড়ল মেয়েটির পা দুখানির দিকে। তাঁর সারা ˋায়ে ধুলো।

পা দুখানি যে ধুলোয় ভরা ! তা' কেউ কি তোমার পা ধুতে জলও দেয় নি ?

না মা ! আমি এক্ষুনি চ'লে যাবো। তোমাকে দেখতে এয়েছি। ভাবনা কি ! তুমি শীগ্‌গীরই সেরে উঠবে।

মেয়েটি সারদামণির পাশে ব'সে তাঁর সারা গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলোতে লাগল।

হ্যাঁ, ভয় নেই। ভালো হবে।

তুমি কোথা থেকে আসছ গা ?

আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।

অবাক হ'য়ে গেলেন সারদামণি !

দক্ষিণেশ্বর থেকে ! মনে করেছিলাম, আমিও দক্ষিণেশ্বরে যাবো। তাঁকে দেখবো। কিন্তু যেতে কি আর পারবো ? রাস্তার মাঝেই পোড়া জ্বর এলো বলি, তুমি দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে দেখেছ ?

কাকে ?

ঠাকুরকে।

দেখেছি বই কি ! দেখেছি।

বড় আশা নিয়েই এসেছিলাম। তাঁকে দেখব। তাঁর সেবা কোরবো। সাধ কি আর মিটবে ? আমার ভাগ্যে কি আর তা' হবে ?

—অন্তর দিয়ে বেরিয়ে এলো এক টানা দীর্ঘশ্বাস। বেরুলো নাক দিয়ে মুখ দিয়ে।

কেন হবে না? কেন হবে না? অবশ্যই হবে। তুমি সেরে উঠবে। ভালো হবে। দক্ষিণেশ্বরে যাবে। তাঁকে দেখবে।

স্মিতহাস্যে গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে মেয়েটি আবার বলল, ওগো, তোমার জন্যেই যে তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।

কথা শুনে সারদামণি যেন পরম নিশ্চিন্ত হ'লেন। জ্বরের মধ্যেই মুখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠলো।

বটে? বটে? ভালো হবো? শীগ্‌গীরই? ভালো হ'য়ে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তাঁকে দেখতে পাবো? বল না, তুমি আমার কে হও? বল না। বল না।

আমি? আমি তোমার বোন হই।

উৎফুল্ল হলেন সারদামণি। চোখে মুখে আনন্দের আভা।

সত্যি? তা-ই বুঝি তুমি এয়েছো। আমার অসুখ শুনে তুমি এয়েছো! বাঃ! বেশ বেশ!—মুখ দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরুলো।

ঘুমিয়ে পড়লেন সাবদামণি।

সকাল হোলো। ঘুম ভেঙ্গে গেল সারদামণির।

জেগে উঠে চাবদিকে তাকান। খোঁজেন সেই মেয়েটিকে।

না, কোথাও তো নেই। কিন্তু গেল কোথায়?

রামচন্দ্র এলেন। সারদামণির কপালে হাত দিয়ে দেখলেন, না, জ্বর নেই। তাকে বেশ সুস্থই দেখাচ্ছে। কাল যে এত জ্বর ছিল, তা যেন আর বোঝাই যায় না।

তিনি বললেন, তবে হাতমুখ ধুয়ে নাও, মা। আবার রওনা হই। যেতে তো হবে।

হ্যাঁ বাবা।

আবার হাঁটা শুরু হোলো।

কিছুদূর যেতে না যেতেই পাওয়া গেল একখানা পালকী। এই বিজন পথে পালকী! অবাক হ'লেন দুই জনেই। কে পাঠালো? সেই মেয়েটি?

যাক্। ভাবনা দূর হোলো।

দুপুরের দিকে আবার জ্বর এলো সারদামণির।

তা হ'ক্। অত ভাবনা আর নেই। নেই দুশ্চিন্তা। পালকী মিলেছে তো। যাওয়া আট্‌কাচ্ছে না।

যেতে পারবে তো মা?—বাবা জিজ্ঞাসা করেন।

হ্যাঁ, বাবা। পারবো। পালকী মিলেছে। আর ভাবনা কি!

সন্ধ্যার কিছু পরে তাঁরা গঙ্গার ঘাটে পৌঁছলেন।

পেলেন সঙ্গে সঙ্গে পারের নৌকো।

আন্দাজ নয়টার সময় নৌকো এসে ঘাটে লাগল। দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে। নামলেন দুইজনে। বাপ আর মেয়ে। রামচন্দ্র আর সারদামণি।

খবর গেল গদাধরের কাছে।

হৃদু, ও হৃদু! বারবেলা নেই তো! এই প্রথমবারে আসছে।

সারদামণি এলেন গদাধরের ঘরে। ঘোমটায় মুখখানি ঢাকা। প্রণাম কোরলেন গদাধরকে।

এসেছ? বেশ করেছ। বেশ করেছ। ওরে, একখানা মাদুর পেতে দে। কতদূর থেকে আস্‌ছেরে! তার উপরে আবার অসুখ নিয়ে এসেছে। এখন কি আর আমার সেজবাবু আছে যে তোমাকে যত্ন করবে! আমার ডান হাত ভেঙ্গে গিয়েছে। তোমাকে এখন কোথায় রাখি? কোথায় রাখি? থাকতেন আমার সেজবাবু। তিনি তোমায় অট্টালিকায় রাখতেন। তা' এলেই যদি তো এত দেরী ক'রে এলে কেন? আমার সেজবাবুকে দেখতে পেলে না।

মাত্তুর বিছিয়ে দিল হৃদয়।

গদাধর তিন চার দিন সারদামণিকে নিজের ঘরে রাখলেন। ওষুধ পত্তরের বিশেষ বন্দোবস্ত করলেন। দিবারাত্র কাছে রেখে সব বিষয়ে খোঁজ খবর নিলেন।

তার পর সুস্থ ক'রে তুলে নহবৎ ঘরে নিজের মা-র কাছে থাকবার বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন।

এক দিন সারদামণি গদাধরের পদসেবা করছিলেন।

পদসেবা করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন,

আমাকে তোমার কি ব'লে বোধ হয়?

গদাধর বললেন,

যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করছেন। আর, তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ ব'লে তোমাকে সর্বদাই দেখতে পাই।

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

গোপালের মা

একদিন দুইজন মহিলা এলেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এঁদের সাদরে বসিয়ে নানা উপদেশ দিলেন, গান গেয়ে শোনালেন।

বিদায় নেবার সময় এঁরা প্রণাম করছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, আবার এসো।

এঁরা চলে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন এই দুই মহিলার খুব প্রশংসা করেছিলেন। বলেছিলেন, আহা, চোখমুখের কি ভাব! ভক্তি-প্রেমে যেন ভাসচে। প্রেমময় চোখ। নাকের তিলকটি পর্যন্ত সুন্দর!

এঁরা কে কে?

এঁদের একজন পটলডাঙ্গার গোবিন্দচন্দ্র দত্তের সহধর্মিণী।—যে গোবিন্দচন্দ্র কামারহাটির বাগানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন।

অপরজন হলেন গোবিন্দচন্দ্রের পুরোহিত নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভগ্নী—নাম অঘোরমণি।

অঘোরমণি বালবিধবা, নিঃসন্তান। তিনি গঙ্গাতীরে কামারহাটির ঠাকুর-বাড়ীতেই থাকেন!

অঘোরমণি গুরুদেবের নিকট হ'তে গোপাল মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। বাৎসল্যভাবে সর্বক্ষণ তিনি বিভোর থাকতেন। শ্রীভগবানকে তিনি নিজ পুত্র মনে ক'রে গোপালভাবে ভজনা করতেন।

প্রথম জীবনে অঘোরমণির ছিল বেজায় আচার-বিচার।

একদিন তিনি রান্না ক'রে হাড়ি থেকে ভাত তুলে শ্রীরামকৃষ্ণের পাতে পরিবেশন করছেন, এমন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ ভাতের কাঠিটি ছুঁয়ে ফেলেন। অঘোরমণির সে ভাত আর খাওয়া হোলো না। কাঠি ফেলে দিলেন গঙ্গায়।

মাঝে মাঝে অঘোরমণি সারদা মা-র সঙ্গে নহবৎখানায় রাত্রি বাস করতেন।

সেদিন অঘোরমণি সেখানেই খাবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ঝোল-ভাত রাঁধার পর সারদা মা-কে গোবর গঙ্গাজল এই সব দিয়ে তিন তিনবার উনুন পেড়ে দিতে হোলো। তবে তাতে অঘোরমণির হাঁড়ি চাপলো।

এতই ছিল তাঁর আচার বিচার! ছোঁওয়া-ছুঁইয়ির বালাই।

অঘোরমণিকে শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও কামারহাটির বামুন ঠাকরুণ, কখনও বা বামনী বলতেন।

ইচ্ছা হলেই অঘোরমণি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে চ'লে আসতেন। আসবার সময় তিনি দুই তিন পয়সার দেদো সন্দেশ কিনে নিতেন!

তাঁকে দেখামাত্রই আনন্দে যেন মেতে উঠতেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

এই যে, এসেছ! আমার জন্যে কি কি এনেছ, দাও।

অঘোরমণি ভেবেই পান না, কেমন ক'রে তিনি এই খারাপ সন্দেশ সকলের সামনে বের করবেন। ঠাকুরকে কত লোক কত কি ভালো ভালো জিনিস এনে খাওয়াচ্ছে। আবার, তা-ও কিনা আসামাত্রই খেতে চাওয়া!

ভয়ে লজ্জায় কিছুই বলতে পারেন না আঘোরমণি। তিনি নীরবে সেই সন্দেশ বের ক'রে দিলেন। রইলেন সংকুচিত হ য়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণের কিন্তু কি আনন্দ! কি উল্লাস! খেতে খেতেই বলেন, দ্যাখো. তুমি পয়সা খরচ ক'রে সন্দেশ আনো কেন? নারকেল নাড়ু ক'রে রাখবে, তাই দুটো একটা আসার সময় আনবে। না-হয়, যা তুমি নিজের হাতে রাঁধবে—এই ধর, লাউশাক চচ্চড়ি আলু বেগুন বড়ি দিয়ে সজনে খাড়ার তরকারি—তাই নিয়ে আসবে। তোমার হাতের রান্না খেতে আমার বড় সাধ হয়।

অঘোরমণির ভাবনা হয়। ধর্মকর্মের কথা দূরে গেল, শুধুই খাবার

কথা। ভালো সাধু দেখতে এয়েছি। কেবল খাই খাই, কেবল খাই খাই। গরীব কাঙাল আমি—কোথা থেকে এত খাওয়াতে পারবো? দূর হোক্—আর আসবো না।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির পেরুতে না পেরুতেই কে যেন পিছন থেকে টানতে শুরু করে। কোনও মতে এগুতে আর পারেন না। কত ক'রে মনকে বুঝিয়ে, টেনে হিঁচ্ড়ে তবে কামারহাটি ফেরেন অঘোরমণি।

ওঃ হরি! দু-একদিন বাদেই অঘোরমণি তিন মাইল পথ হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত। হাতে এক বাটি চচ্চড়ি। বের করলেন লজ্জায় সংকোচে।

মহা খুসী! শ্রীরামকৃষ্ণ সেই চচ্চড়ি খেয়ে বললেন,

আর আছে? দাও না আর একটু! আহা, কি রান্না! সুধা সুধা!

সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দ দেখে কে!

অঘোরমণির চোখে এলো জল। সে জল আর বাধা মানে না।

গরীব কাঙাল আমি। তাই ঠাকুর আমার এই তুচ্ছ জিনিসের এত বড়াই করছেন।

দিন যায়।

অঘোরমণি ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে আসেন। যে দিন যা রাঁধেন, ভালো লাগলেই নিয়ে আসেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সে সব কত আনন্দ ক'রেই খান! মাঝে মাঝে বলেন, সুষ্নি শাক সস্‌সড়ি, কলমি শাক চচ্চড়ি—এই সব আনতে পার? এনো না মাঝে মাঝে। খেতে বড় সাধ হয়।

মাঝে মাঝে বিরক্তই হন অঘোরমণি। শুধু এটা এনো, ওটা এনো। সব সময়ই খাই খাই।

গোপাল, তোমাকে ডেকে শেষে এই হোলো? এমন সাধুর কাছে নিয়ে এলে যে কেবল খেতে চায়! দূর ছাই! আর আসবোই না।

কিন্তু বললেই হোলো ?

দক্ষিণেশ্বরের টান কি যে সে টান ! সে বড় শক্ত কাছির টান ! দূরে গেলেই মনে হয়, যাই-না একবার, এখুনি যাই।

অঘোরমণির বায়ুপ্রধান ধাত্ ছিল। ঘুম হোতো না বললেই হয়। কখনও কখনও তাঁর বুক ধড়ফড় কোরতো, প্রাণ কেমন ক'রে উঠতো।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ও তোমার হরি বাই। ওটা গেলে কি নিয়ে থাকবে গো ? যখন অমন হবে তখন কিছু খেও।

নিশুতি রাত। আন্দাজ তিনটে বাজে।

জপে বসেছেন অঘোরমণি। জপ সাঙ্গ ক'রে প্রাণায়াম করতে আরম্ভ করেছেন, এমন সময়ে তিনি দেখতে পেলেন এক অপূর্ব দৃশ্য।

তিনি স্পষ্ট দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তারই বাঁ পাশে, একেবারে কাছে ব সে। তাঁর ডান হাত যেন মুঠো করা রয়েছে।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে হামেশাই যেমন দেখে থাকেন। এ-ও যেন ঠিক তেমনিই স্পষ্ট, তেমনই জীবন্ত।

অঘোরমণি ভাবলেন, একি ! এমন সময়ে ইনি কোথা থেকে, কেমন ক'রে এখানে এলেন ?

অবাক হ'য়ে তাঁকে দেখছেন, আর ঐ কথাই ভাবছেন। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ ব'সে মুচকি মুচকি হাসছেন। কি মধুময় হাসি !

সাহসে ভর ক'রে বাঁ হাত দিয়ে অঘোরমণি যেই না শ্রীরামকৃষ্ণের বাঁ হাতখানি ধরেছেন, অমনি সেই মূর্তি কোথায় গেল, আর, তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো দশ মাসের সত্যিকার গোপাল। হামা দিয়ে এক হাত তুলে অঘোরমণির মুখপানে চেয়ে সে বললো, মা, ননী দাও।

সে কি রূপ ! সে কি চাউনি !

অঘোরমণি চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলেন। বললেন,

বাবা, আমি যে দুঃখিনী, কাঙালিনী। আমি তোমায় কি খাওয়াবো? ননী ক্ষীর কোথায় পাবো, বাবা?

গোপাল কি কথা শোনে!

শুধুই খেতে দাও, খেতে দাও!

কি আর করেন অঘোরমণি! অগত্যা কাঁদতে কাঁদতে উঠে সিকে থেকে শুক্‌নো নারকেল নাড়ু পেড়ে তিনি গোপালের হাতে দিলেন।

বাবা গোপাল, আমি তোমায় এই তুচ্ছ সামগ্রী খেতে দিলুম ব'লে আমায় যেন ঐ সব খেতে দিও না।

সেদিন আর জপ হোলো না অঘোরমণির। সাধ্য কি!

গোপাল এসে কোলে বসে, মালা কেড়ে নেয়, কাঁধে চড়ে, ঘরময় ঘোরাঘুরি করে।

ভোর হোলো। অঘোরমণি পাগলিনীর মত ছুটে চললেন দক্ষিণেশ্বরে।

গোপালও চললো কোলে উঠে। কাঁধে মাথা রেখে।

এক হাত গোপালের পাছায় আর এক হাত পিঠে দিয়ে বুকে ক'রে নিয়ে সারাটি পথ এলেন অঘোরমণি।

স্পষ্ট দেখতে পেলেন তিনি, গোপালের লাল টুকটুকে তুলতুলে পা দুখানি তার বুকের উপর ঝুলছে।

গোপাল, গোপাল ব'লে ডাকতে ডাকতে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দিকে এলেন অঘোরমণি।

অঘোরমণির চেহারা এলোমেলো, পাগলিনীর মত। চোখ দুটি যেন কপালে উঠেছে। আঁচল ভূঁয়ে লুটোচ্ছে। কোনও কিছুতেই তাঁর যেন ভ্রূক্ষেপ নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন তক্তাপোশের উপর ব'সে।

অঘোরমণির ঐ অবস্থা দেখে তাঁর ভাব হ'য়ে গেল।

ইতিমধ্যে অঘোরমণি এসে শ্রীরামকৃষ্ণের পাশেই ব'সে পড়লেন।

শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁর কোলে গিয়ে বসলেন ছোট্ট ছেলেটির মত।

অঘোরমণির দুই চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগলো। বিন্দু বিন্দু নয়, ধারায় ধারায়। যে ক্ষীর সর ননী এনেছিলেন সঙ্গে ক'রে খাওয়াতে লাগলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। বেশ কিছুক্ষণ।

তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ আপনার তক্তাপোশে আবার এসে বসলেন।

অঘোরমণির কিন্তু সে ভাব আর থামে না। আনন্দে তিনি নাচতে লাগলেন। নেচে নেচে গাইতে লাগলেন, ব্রহ্মা নাচে, বিষ্ণু নাচে, আর নাচে তারা।······

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, দেখ দেখ, আনন্দে ভ'রে গেছে। ওর মনটা এখন গোপাল-লোকে চ'লে গেছে।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসে ভাত খাবার সময় প্রেমে ভরপুর হ'য়ে ঘরে যে যে ছিলেন গোপাল ব'লে সবাইকে নিজের হাতে খাইয়ে দিলেন অঘোরমণি।

ভাবে বিভোর হ'য়ে দক্ষিণেশ্বরে এলেন একদিন। কাঁদতে কাঁদতে শ্রীরামকৃষ্ণকে কত কথাই বললেন! কি মধুর কথা!

কখনও বলেন, এই যে গোপাল আমার কোলে!

কখনও শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়ে বলেন, ঐ তোমার ভিতর আমার গোপাল মিশে গেল।

কখনও বা বলেন, ঐ ঐ, আবার বেরিয়ে এলো।

আবার কখনও বা বলেন, আয় বাবা, আয়। দুঃখিনী মা-র কাছে আয়।

এই দিন থেকে অঘোরমণি সবার কাছেই গোপালের মা হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে ডাকতে শুরু করলেন ঐ নামে। গোপালের মা।

শ্রীরামকৃষ্ণ গোপালের মা-র এই অবস্থা দেখে কত আনন্দ প্রকাশ করলেন! শান্ত করবার জন্যে তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন। ঘরে

যত কিছু ভালো ভালো খাবার ছিল সব এনে তাঁকে খাওয়াতে লাগলেন।

গোপালের মা বললেন, বাবা গোপাল, তোমার দুঃখিনী মা এ জন্মে বড় কষ্টে কাল কাটিয়েছে। টেকো ঘুরিয়ে স্মুতো কেটে পৈতে ক'রে বেচে দিন চালিয়েছে। তাই বুঝি তুমি এত আদর যত্ন করছো।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের কাছেই রাখলেন গোপালের মা-কে সারাটি দিন। সন্ধ্যার কিছু আগে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন কামারহাটি।

এ সময়েও গোপাল চললো সঙ্গে সঙ্গে। কোলে উঠে।

রাতে গোপালের মা গোপালকে কাছে নিয়ে তক্তাপোশের উপর বিছানায় শুলেন। ঘুমুবেন।

বড় গরীব গোপালের মা। মাথায় দেবার একটা বালিশও তাঁর নেই।

বিনা বালিশে শুধু মাথায় শুয়ে গোপাল খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলো।

অগত্যা নিজের বাঁ হাতের পরে গোপালের মাথা রেখে কোলের গোড়ায় শুইয়ে কত কি ব'লে গোপালের মা গোপালকে ভুলোতে লাগলেন।

বাবা, আজ এইভাবেই শোও। রাত পোহালেই কলকাতায় গিয়ে ভুতোকে ব'লে বিচি ঝেড়ে বেছে নরম তুলতুলে বালিশ তোমায় ক'রে দেবো। আজ ঘুমোও, লক্ষ্মীটি আমার! সোনা আমার! ধন আমার! বাপ আমার!

পরদিন সকাল সকাল রান্না ক'রে গোপালকে খাওয়াবার জন্যে বাগান হ'তে শুক্‌নো কাঠ কুড়োতে গেলেন গোপালের মা। দেখলেন, স্পষ্ট দেখতে পেলেন গোপালের মা, গোপালও সঙ্গে সঙ্গে এসে কাঠ কুড়োচ্ছে। তার পরে রান্নাঘরে সেই সব কাঠ এনে জমা ক'রে রাখছে। মা-কে সাহায্য করছে।

মায়ে পোয়ে কাঠ কুড়োনো শেষ হোলো। রান্না হবে।

রান্নার সময়ে দুরন্ত গোপাল কখনও গোপালের মা-র কাছে ব'সে, কখনও কাঁধে পিঠে চ'ড়ে, সব দেখতে লাগলো। কত কি বলতে লাগলো। কত কি আবদার করতে লাগলো।

গোপালের মা কখনও মিষ্টি কথায় তাকে শান্ত করতে লাগলেন। কখনও বকতে লাগলেন।

একদিন গোপালের মা নহবতে ব'সে জপ সাঙ্গ ক'রে উঠছেন, এমন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটি হ'তে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

তুমি এখনও এত জপ কর কেন ? শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন। তোমার তো খুব হয়েছে।

জপ কোরবো না ? আমার কি সব হয়েছে ?

সব হয়েছে।

সব হয়েছে ?

হ্যাঁ, সব হয়েছে।

বল কি, সব হয়েছে ?

হ্যাঁ, তোমার আপনার জন্যে জপতপ সব করা হ'য়ে গিয়েছে। তবে (নিজের শরীর দেখিয়ে) এই শরীরটে ভালো থাকবে ব'লে ইচ্ছে হলে কোরতে পার।

তবে এখন থেকে যা' কিছু কোরবো, সব তোমার, তোমার জন্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে এই কথা শোনার পর গোপালের মা মালা থলি সবই গঙ্গায় ফেলে দিলেন। আর, গোপালের, তার মানে শ্রীরামকৃষ্ণের, কল্যাণের জন্যেই জপ কোরতেন। তারপর অবশ্য অনেকদিন বাদে আবার মালা নিয়েছিলেন।

একটা কিছু করতে হবে তো। চব্বিশ ঘণ্টা করি কি। তাই তাঁর কল্যাণেই মালা ঘোরাই। এই কথা বলেছিলেন গোপালের মা এক অনুরক্ত মহিলাকে।

গোপালের মা-র জপ তপ শেষ হোলো। দক্ষিণেশ্বরে ঘন ঘন

যাতায়াত বেড়ে গেল। খাওয়া দাওয়ার বাদ বিচার—সেও ঘুচে গেল। তাঁর গোপাল তাঁর মনপ্রাণ হরণ ক'রে নিয়েছেন। আর, নিষ্ঠা, বাদবিচার কি ক'রেই বা রাখবেন তিনি? তাঁর গোপাল যে যখন তখন খেতে চায়। খেতে খেতে তার মা র মুখে গুজে দেয়। তা' কি ফেলে দেওয়া যায়? আর, ফেলে দিলেও যে গোপাল কাঁদে।

এমনি ধারা একাদিক্রমে দুই মাস অবিরাম গোপালের মা তাঁর গোপালকে বুকে পিঠে, কোলে ক'রে বাস করেছিলেন।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ গোপালের মা-কে বললেন, তোমার খুব হয়েছে। খুব হয়েছে। কলিতে এমন অবস্থা বরাবর থাকলে শরীর থাকে না। বুঝলে?

সেদিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা।

বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ীতে উৎসব।

শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন সেখানে। এসেছেন ভক্তজনেরা।

কথায় কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে গোপালের মা-র সৌভাগ্যের কথা বললেন।

ওগো, সেই যে কামারহাটি থেকে বামনের মেয়েটি আসে, যার গোপাল ভাব, তার কত কি দর্শন হয়েছে! সে বলে, গোপাল তার কাছে হাত পেতে খেতে চায়। সে দিন ঐ সব কত কি দেখে শুনে ভাবে প্রেমে উন্মত্ত হ'য়ে উপস্থিত। খাওয়াতে দাওয়াতে একটু ঠাণ্ডা হোলো। থাকতে বললুম, থাকলো না। খাবার সময়ও সেইরূপ উন্মাদ। গায়ের কাপড় খুলে লুটিয়ে যাচ্ছে। হুঁশ নেই। আমি আবার কাপড় তুলে দিয়ে বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। খুব ভক্তি বিশ্বাস! বেশ! তাকে এখানে আনতে পাঠাও না।

বলরাম বাবুর কানে উঠলো ঐ কথা। ক্ষণমাত্র বিলম্ব করলেন না। লোক পাঠালেন কামারহাটি গোপালের মা-কে আনতে।

শ্রীরামকৃষ্ণের খাওয়া হয়েছে। প্রসাদ পেয়েছেন ভক্তেরা।

তিনি এখন হলঘরে ব'সে সকলের সঙ্গে নানা কথা বলছেন। সন্ধ্যা হয় হয়।

এমন সময়ে তাঁর ভাবাবেশ হোলো।

বালগোপালের ছবি বা বিগ্রহমূর্তি দেখেছি সবাই। দুই হাঁটু ও এক হাত ভূমিতে হামা দেওয়ার অবস্থায় রেখে অন্য হাতখানি উপর দিকে তুলে যেন আর কার মুখের দিকে আনন্দে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রয়েছেন। মনে হচ্ছে, হাত পেতে কি যেন চাইছেন। ভাবাবেশে শ্রীরামকৃষ্ণেরও ঠিক এমনধারা বালগোপালভাব হ'য়ে গেল। হাত পা এই সব ঠিক এমনটিই। চোখ দুটো রয়েছে আধ বোজা অবস্থায়। বাইরের দিকে দৃষ্টি নেই।

উপস্থিত সকলেরই আনন্দের ও বিস্ময়ের অবধি রইলো না।

ঠিক এমন সময়েই সেখানে উপস্থিত হলেন গোপালের মা। তিনি এসেই শ্রীরামকৃষ্ণকে নিজের ইষ্ট দেবতারূপে দেখলেন।

সকলেই বুঝতে পারলেন, গোপালের মা-র ভক্তির জোরেই ঠাকুরের হঠাৎ এই ভাবাবেশ। তাঁরা ভাগ্যবতী গোপালের মা-র বন্দনা করতে লাগলেন। তাঁকে অশেষ সম্মান দেখাতে লাগলেন।

সবাই বলতে লাগলেন, কি ভক্তি! কি ভক্তি! এঁরই ভক্তির জোরে ঠাকুর আজ সাক্ষাৎ গোপালরূপ ধারণ করেছেন।

গোপালের মা-র কিন্তু আনন্দ উল্লাস নেই। নেই ভাবে গদগদ হ'য়ে ভূঁয়ে লুটিয়ে পড়া।

আমি কিন্তু, বাপু, ভাবে অমন কাঠ হ'য়ে যাওয়া মোটেই ভালবাসি নে। আমার গোপাল হাসবে খেলবে দৌড়োবে। ওমা, এ কি! একেবারে যেন কাঠ! অমন গোপাল দেখে কাজ নেই আমার।

মনে আছে না? সেই প্রথম যে দিন তিনি কামারহাটির ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের এমনধারা বাহ্যজ্ঞান হারানো অবস্থা দেখেছিলেন, ভয়ে কাতর হ'য়ে তাঁর অঙ্গ ঠেলতে ঠেলতে বলেছিলেন, ও বাবা, বলি, ও বাবা, তুমি অমন হ'লে কেন? তুমি অমন হ'লে কেন?

এই গোপালের মা।

গোপালের মা যেদিন তাঁর গোপালকে প্রথম দর্শন করেন, তার দুই মাস পর থেকে সে দর্শন আর সদা সর্বক্ষণ হোতো না। তবে দিনের মধ্যে দু-দশ বার গোপালের দর্শন তিনি রোজ পেতেন। এর অন্যথা হোতো না।

তাঁর গোপাল বার বার ঠাকুরের মধ্যে মিশে গিয়ে বা ঠাকুরের অঙ্গ থেকে বের হ'য়ে তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি আর শ্রীরামকৃষ্ণ এক অভিন্ন। মাঝে মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণকেও দর্শন হোতো।

একদিন সে কি কান্না! সে কান্না থামে না। কাঁদতে কাঁদতেই সোজা চ'লে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। উপস্থিত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে।

গোপাল, তুমি আমার কি করলে! আমার কি অপরাধ হোলো? কেন আর আমি তোমায় আগেকার মত দেখতে পাইনে?

অমন সদা সর্বক্ষণ দর্শন হ'লে কলিতে শরীর থাকে না! একুশ দিন মাত্র শরীরটা থেকে তার পর শুক্‌নো পাতার মত ঝ'রে প'ড়ে যায়। বুঝলে? ঠাকুর উত্তর দিয়েছিলেন।

গোপালকে আর আগের মত দেখতে পান না। গোপালের মা-র ক্রমে ক্রমে এক বিপরীত ব্যাকুলতা এলো।

তাঁর বায়ু-প্রধান ধাত্। বায়ুর প্রকোপ বেড়ে বুকের ভিতর একটা দারুণ যন্ত্রণা হোতে লাগলো।

গোপালের মা ঠাকুরকে বললেন, বাই বেড়ে বুক যেন আমার করাত দিয়ে কেউ চিরচে।

ও তোমার হরি বাই। ও গেলে কি নিয়ে থাকবে গো? ও থাকা ভালো! যখন বেশী কষ্ট হবে তখন কিছু খেও।

একদিন কয়েকজন মাড়োয়ারী ভক্ত এলেন দক্ষিণেশ্বরে! তাঁরা প্রচুর ফল মিছরি এই সব সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

গোপালের মা ঠিক এমন সময়ে এসে সেখানে উপস্থিত হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ গোপালের মা-র শরীরটে সবাইকে দেখিয়ে বললেন, এ খোলটার ভেতর কেবল হরিতে ভরা! হরিময় শরীর।

গোপালের মা দাঁড়িয়ে রইলেন চুপটি ক'রে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কাছে এলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোপালের মা-র মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে হাত বুলোতে বুলোতে ছেলে যেমন তার মা কে পেয়ে আদর করে ঠিক তেমনিই আদর করতে লাগলেন।

গোপালের মা একটুও সঙ্কুচিত হলেন না! লজ্জা পেলেন না।

তারপর ঘরে যত ভালো ভালো খাবার ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ এনে গোপালের মা-কে খাওয়াতে লাগলেন।

একদিন গোপালের মা শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন,

গোপাল তুমি আমায় এত খাওয়াতে ভালবাস কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বললেন, তুমি যে আমায় আগে কত খাইয়েছ।

ওমা, আগে কবে খাইয়েছি!

জন্মান্তরে। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন।

গোপালের মা বিদায় নেবার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মাড়ওয়ারীদের দেওয়া সব মিছরি এনে তাঁকে দিলেন।

এত মিছরি! সব দিচ্ছ কেন? গোপালের মা বললেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ গোপালের মা-র চিবুক ধ'রে আদর করতে করতে বললেন, ওগো, ছিলে গুড়, হ'লে চিনি। তারপর হ'লে মিছরি। এখন মিছরি হয়েছ। মিছরি খাও আর আনন্দ কর। মিছরি খাও আর আনন্দ কর।

গোপালের মা যা' যা' দেখতেন সব বলতেন শ্রীরামকৃষ্ণকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, দর্শনের কথা বলতে নেই! তা হ'লে আর হয় না।

গোপালের মা বলেন, কেন? সে সব-তো তোমারই দর্শনের কথা। তোমায়ও বলতে নেই?

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, এখানকার দর্শন হলেও আমাকে বলতে নেই।

এর পর দর্শনের কথা গোপালের মা আর কাউকে বড় একটা বলতেন না।

একদিন গোপালেব মা ও নরেন্দ্রনাথ দুজনেই দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত। নরেন্দ্রনাথ তখনও স্বামী বিবেকানন্দ হননি।

নরেন্দ্রনাথের তখনও ঝোঁক ব্রাহ্মসমাজের দিকে। ঠাকুর দেবতায় কিছুটা তাঁর যেন বিদ্বেষ! তবে এটা ধারণা হয়েছে, প্রতিমা অবলম্বন ক'রেও নিরাকার ব্রহ্মে পৌঁছনো যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বড়ই রহস্যপ্রিয় ছিলেন। রহস্য করবার সখ হোলো।

একদিকে মস্ত বড় পণ্ডিত যুবক নরেন্দ্রনাথ। যাঁর মেধার তুলনা নেই। বিচার না ক'রে যিনি কোনও কিছু মানতে রাজী নন। অথচ ধর্মে তাঁর প্রবল আস্থা।

অন্যদিকে নিতান্ত গরীব, সরল বিশ্বাসী গোপালের মা। যিনি লেখাপড়া জ্ঞান বিচারের পথেও পা বাড়ান না। যিনি নিজের ইষ্ট-দেবকে সাক্ষাৎ দেখতে পেয়েছেন, এইটুকু অবলম্বন ক'রেই আনন্দে মশগুল থাকেন সর্বক্ষণ। গোপালই তাঁর ধ্যান জ্ঞান। গোপালই জপতপ। আর কোনও দিকে তাঁর জ্ঞানগম্যি নেই। গোপালই যথাসর্বস্ব।

এই দুইজনকে একত্রে পেয়ে রসিক ঠাকুর মজা বাধিয়ে দিলেন।

গোপালের মা গোপালের দর্শন পেয়েছেন, আর, তার পর থেকে গোপাল যেভাবে যেমনটি ক'রে চলেছেন, সেই সব কথা তিনি নরেন্দ্রের কাছে বলতে বললেন গোপালের মা-কে।

গোপালের মা সরলভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, তা-তে কিছু দোষ হবে না তো, গোপাল?

না, হবে না। তুমি বল।

শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্বাস পেয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ভারী গলায় প্রথম গোপাল দর্শনের পর থেকে দুই মাস ধ'রে যত খেলা খেলেছেন গোপাল, সে সব আগাগোড়া বলতে লাগলেন। বলতে

লাগলেন, কেমন ক'রে গোপাল তাঁর কোলে উঠে মাথা রেখে কামারহাটি থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত সারা পথ এসেছিল। তার লাল টুকটুকে পা দুখানি তাঁর বুকের উপর ঝুলছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গে কেমন প্রবেশ ক'রে আবার বের হ'য়ে তাঁর কাছে এসেছিল। রাতে শোবার সময় মাথায় বালিশ না পেয়ে বারবার খুঁৎ খুঁৎ করছিল! রাঁধবার কাঠ কুড়িয়ে রান্নাঘরে এনে তা' জমা করেছিল। খাবার জন্যে কত দৌরাত্ম্য করেছিল। সব কথা সবিস্তারে বললেন নরেন্দ্রনাথকে।

আগ্রহের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ শুনছিলেন এই সব কথা।

এই সব কথা বলতে বলতে গোপালের মা ভাবে বিভোর হ'য়ে পড়লেন।

গোপাল আবার দর্শন দিলেন তাঁকে।

নরেন্দ্রনাথের বাইরেটায় যতই থাক শুষ্ক জ্ঞানবিচারের আবরণ, তার আড়ালে কিন্তু ছিল ভক্তিপ্রেমের পূর্ণপাত্র। তিনি গোপালের মা-র ভাবাবেশ দেখে আর গোপাল-দর্শন ও তাঁর লীলাবিলাসের কথা শুনে চোখের জল রোধ করতে পারলেন না। কাঁদতে লাগলেন।

গোপালের মা সরলভাবে নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা, তুমি পণ্ডিত বুদ্ধিমান। আমি দুঃখী, কাঙালী! কিছুই জানিনে আমি। কিছুই বুঝিনে। তুমি বল। ওগো, তুমি বল, আমার এ সব-তো মিথ্যে নয়।

নরেন্দ্রনাথ বললেন, না মা, তুমি যা দেখেছ, সে সব সত্য। সে সব সত্য। সে সব সত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের কিছু আগে তাঁর একবার বাজার থেকে কেনা পালো-মেশানো ক্ষীর খেতে ইচ্ছা হয়েছিল। যোগেন মহারাজকে ক্ষীর কিনে আনতে বললেন।

বাজারের ক্ষীর খেলে ঠাকুরের অসুখ বাড়তে পারে মনে ক'রে

যোগেন মহারাজ বলরামবাটী হ'তে পাক্সো মিশিয়ে ক্ষীর তৈরী করিয়ে নিয়ে এলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ খুব বিরক্ত হলেন। যোগেন মহারাজকে বললেন, তোকে বাজার থেকে কিনে আনতে বলা হোলো, বাজারের ক্ষীর খাবার ইচ্ছে, তুই কেন ভক্তদের বাড়ী গিয়ে তাদের কষ্ট দিয়ে ক্ষীর নিয়ে এলি ?

তারপরে আবার বললেন, ও ক্ষীর ঘন, গুরুপাক, ওকি খাওয়া চলবে ! ও আমি খাব না।

তিনি ও ক্ষীর স্পর্শও করলেন না।

সারদামা-কে ডেকে সবই গোপালের মা-কে খাওয়াতে বললেন। ওর ভেতর গোপাল আছে। বুঝলে ? ও খেলেই আমার খাওয়া হবে। ভক্তের দেওয়া জিনিস।

শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর একবার গোপালের মা মাহেশে রথযাত্রা দেখতে গিয়েছিলেন। সেবার তিনি সর্বভূতে গোপালের দর্শন পেলেন।

রথ, রথের উপর শ্রীজগন্নাথ, যারা রথ টানছে সেই সব লোক— সবই দেখেন তাঁর গোপাল। তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ ক'রে রয়েছেন, এই মাত্র।

এমনি ভাবেই শ্রীভগবানের বিশ্বরূপের দর্শনাভাস পেয়ে ভাবে প্রেমে উন্মত্ত হ'য়ে তাঁর আর বাহ্যজ্ঞান ছিল না।

তিনি বলতেন, তখন আর আমাতে আমি ছিলাম না। হেসে নেচে কুরুক্ষেত্র করেছিলাম।

শেষ বয়সে গোপালের মা অসুস্থ হ'য়ে পড়েন। শরীর অপটু হ'য়ে পড়লো। বিশেষ যত্ন ক'রে ভক্তজনেরা নিয়ে এলেন তাঁকে বলরাম বসুর বাড়ীতে।

গোপালের মা-র অদ্ভুত জীবনকথা ভগিনী নিবেদিতা শুনেছিলেন

তিনি তাঁর পরে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েন। তিনি এতই মুগ্ধ ছিলেন যে, তিনি তাঁর সেবা পরিচর্যা করবেন, ক'রে ধন্য হবেন, এই বিশ্বাসে বলরামবাটি থেকে নিজের কাছে আনবার জন্যে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

গোপালের মা সম্মত হলেন। এলেন ভগিনী নিবেদিতাব কাছে। তিনি অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর সেবা শুশ্রূষা করতে লাগলেন।

এইভাবে সেখানে রইলেন দুই বছর।

দেহত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে তাঁকে গঙ্গাতীরে আনা হোলো। ভগিনী নিবেদিতা ফুল চন্দন মালা দিয়ে তাঁর বিছানা নিজ হাতে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিলেন। আনালেন একজন কীর্তনীয়া। নিজে খালি পায়ে কাঁদতে কাঁদতে গঙ্গাতীর পর্যন্ত গেলেন।

দুইদিন এইভাবে কেটে গেল।

এই দুই দিন ভগিনী নিবেদিতা গঙ্গাতীরে গোপালের মা-র সঙ্গেই রাত্রি যাপন করলেন।

তারপরে এল বিদায়ের ক্ষণ, শুভ লগ্ন।

পুণ্য সুরধনী তীরে এলেন অসংখ্য ভক্তজন। তাঁদের সবারই কণ্ঠে গোপাল, জয় গোপাল ধ্বনি।

অবিরাম গোপাল-ধ্বনির মধ্যেই গোপালের মা হাসতে হাসতে 'গোপাল, আমার গোপাল' বলতে বলতে গোপাল-লোকে চ'লে গেলেন।

অসংখ্য উজ্জ্বল তারকায় সমৃদ্ধ বঙ্গ-গগন থেকে একটি স্নিগ্ধ তাবকা চিরকালের মত গঙ্গাগর্ভে বিলীন হ'য়ে গেল।

জয় গোপাল! জয় গোপাল! জয় গোপাল!

শ্যামসুন্দর ও শ্রীবিজয়কৃষ্ণ

শান্তিপুর।

প্রভু অদ্বৈত আচার্যের বংশ।

সেই বংশেরই একজন উত্তরপুরুষ হলেন আনন্দকিশোর গোস্বামী। তিনি একজন নিষ্ঠাবান পরম ভক্ত।

আনন্দকিশোর নিত্য নারায়ণ পূজা করেন। পূজা না ক'রে তিনি জলগ্রহণও করেন না।

আনন্দকিশোরের পুরীধামে যাবার প্রবল বাসনা হোলো। দর্শন করবেন শ্রীজগন্নাথদেবকে।

বিলম্ব সইলো না। বেরিয়ে পড়লেন। যাত্রা কবলেন নিত্য-আরাধ্য শালগ্রাম শিলা গলায় বেঁধে।

'জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।'

আনন্দকিশোর পুরী চলেছেন।

গাড়ীতে চ'ড়ে নয়। পালকীতে নয়। পায়ে হেঁটেও নয়। তবে ?

পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। এই প্রৌঢ় বয়সেও তিনি চলেছেন বুকে হেঁটে গণ্ডী কাটতে কাটতে।

শান্তিপুর থেকে পুরী কম ক'রে বললেও তুইশ ক্রোশ পথ।

এত দীর্ঘ পথ।

শক্ত মাটির ঘষা লাগে অবিরাম। ঘষায় ঘষায় তাঁর নাকে বুকে হাতে পায়ে ক্ষত জন্মেছে। তবুও পথ চলার বিরাম নেই। গণ্ডী কাটারও বিরাম নেই। ক্ষত দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। রক্ত ঝরছে। ঝরুক। সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। সঙ্কল্পচ্যুত হবার লোক তিনি নন। কষ্ট পেয়েই তো কৃষ্ণকে পেতে হয়। ক্লেশ পেয়ে ক্লেশ-নাশনকে।

আনন্দকিশোর চলেছেন। সর্ব অঙ্গে কাপড় জড়িয়ে ধূলি ধূসরিত দেহে গণ্ডীর পর গণ্ডী কেটে তিনি চলেছেন।

জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।

কল্পনাতীত এমনি অস্বাভাবিক কষ্ট ক'রে পথ চলতে চলতে পুরো একটি বছর পার হ'য়ে গেল। তারপরে একদিন এসে লুটিয়ে পড়লেন শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে। সম্মুখে তীর্থপতি শ্রীজগন্নাথ।

দুই নয়নে অশ্রুর বন্যা। অবরুদ্ধ তাই দৃষ্টিপথ। মুখে আকুল আর্তনাদ।

জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।

রাত্রি হয়েছে।

আনন্দকিশোর শুয়ে পড়েছেন। অটল বিশ্বাসে স্তব ক'রে মনের তৃপ্তিতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পরেই স্বপ্ন দেখলেন, এক মধুর স্বপ্ন।

মন্দির থেকে শ্রীজগন্নাথ ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন। দাঁড়ালেন তাঁরই সম্মুখে। কথা কইলেন।

আনন্দকিশোর, তোমার ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তুমি বাড়ী ফিরে যাও। অচিরেই আমি তোমার পুত্র হ'য়ে জন্মগ্রহণ কোরবো।

বিস্মিত হলেন আনন্দকিশোর।

এ কী অসম্ভব কথা!

দুই দুইবার বিবাহ করেছেন আনন্দকিশোর। নিঃসন্তান অবস্থায় দুই স্ত্রী-ই গত হয়েছেন। এখন তিনি বিপত্নীক।

বাড়ী ফিরে এলেন বয়স পঞ্চাশ হ'লেও আবার বিবাহ করলেন। স্বয়ং শ্রীজগন্নাথের অনুজ্ঞা।

তৃতীয় পত্নী হলেন স্বর্ণময়ী। গৌরীপ্রসাদের কন্যা স্বর্ণময়ী।

ঝুলন পূর্ণিমা।

চারিদিকে উৎসবের আনন্দ।

'ঝুলত ব্রজ-নাগর বর চন্দ্রাননি সঙ্গে।'

কৃষ্ণ রাধাকে সঙ্গে নিয়ে একই দোলনায় দুলছেন। সে দোলার ঢেউ লাগে সবাকার প্রাণে। সবাকার প্রাণে আনন্দ। কেবল একটি বাড়ীতে নিরানন্দ। থমথম করছে বিষাদ। গভীর দুঃখ অপমান।

গৌরীপ্রসাদের বাড়ীতে আদালতের পেয়াদা এসেছে। অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোকের পরোয়ানা হাতে।

সে সময়কার ঘটনা। পেয়াদা দেখলেই যে যেখানে পারে পালিয়ে যায়। সংবাদ শুনলেই সকলের চক্ষু চড়কগাছ!

পেয়াদাকে দেখেই গৌরীপ্রসাদের বাড়ীর যে যেদিকে পারে পালিয়ে গেলেন। পালিয়ে গেলেন আসন্নপ্রসবা স্বর্ণময়ীও।

স্বর্ণময়ী গিয়ে লুকিয়ে রইলেন ঘরের পাশে পিটুলি গাছের নীচে কচুবনে।

যেমন ক'রেই হোক মিটে গেল ক্রোকের ঝামেলা। পেয়াদা চ'লে গেল।

সংবাদ পেয়ে ফিরে এলেন একে একে সবাই। শুধু স্বর্ণময়ী আসেন নি।

সবাই খুঁজতে বেরুলেন স্বর্ণময়ীকে।

তাঁকে পাওয়া গেল কচুবনে। শুধু তাঁকে নয়। সদ্যোজাত তাঁর পুত্রকেও। সর্বাঙ্গসুন্দর পুত্র। সবাই আনন্দে মেতে উঠলেন।

শিশুর জন্মক্ষণ যে পরম শুভক্ষণ। আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই পরিবারের সংকট মোচন হ'য়ে গেল।

সংকট-বিজয়ী এই শিশুই বিজয়কৃষ্ণ। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

আনন্দকিশোরের ঠাকুর ঘর।

ঠাকুর ঘরে শ্রীশ্যামসুন্দরের বিগ্রহ রয়েছেন। আর সবাকার কাছে শ্যামসুন্দর ঠাকুর, দেবতা। শিশু বিজয়ের কাছে শ্যামসুন্দর খেলার সাথী, একই বয়সী।

সূর্য অস্ত যায়। সন্ধ্যা আসন্ন।

তখনও ঠাকুর ঘরের দুয়ার বন্ধ।

হঠাৎ দেখা গেল, বিজয় এসে দুয়ার খোলার চেষ্টা করছে। শুরু করেছে ধাক্কা দিতে।

এলেন পুরুৎ ঠাকুর। তিনি এসে দেখলেন বিজয় ঠাকুর ঘরের দুয়ারে ধাক্কা দিচ্ছে।

বিজয়, দরজায় ঘা মারছো কেন?

বল খুঁজছি।

বল খুঁজছো—তা' দরজায় ধাক্কাধাক্কি কেন?

শ্যামসুন্দর আমার বল নিয়ে পালিয়ে এসেছে। রয়েছে লুকিয়ে।

কে বল নিয়ে এসেছে?

শ্যামসুন্দর।

শ্যামসুন্দর? সে আবার কে?

তুমি যার পূজা কর গো, সেই শ্যামসুন্দর।

বলে কি বিজয়! পুরুৎ ঠাকুর হেসে ফেললেন।

হাসছো কেন? সত্যি, শ্যামসুন্দর আমার সঙ্গে এতক্ষণ খেলা করছিল।

পুরুৎ ঠাকুর হাসতেই লাগলেন।

দেখনি আমার সেই লাল বলটা? সেই বলে আমরা দুজনে রোজ খেলা করি। তা জান না?

জোরে ধাক্কা মারলো বিজয় আবার দুয়ারে।

দরজা খুলতে পারলো না। আবার ধাক্কা মারলো। আবার।

দরজা খুললো না।

অগত্যা অনুরোধ শুরু কোরলো।

শ্যামসুন্দর, ভাই লক্ষ্মীটি, দাও না আমার বল। দুয়ার বন্ধ ক'রে কেন ব'সে রয়েছো? বাইরে এসো। আবার খেলবো, আমি দিব্যি কাটছি। আবার খেলবো।

আসবে না? দুয়ার খুলবে না? দাঁড়াও। মজা দেখাচ্ছি। কতক্ষণ থাকবে দুয়ার দিয়ে?

একখানি লাঠি নিয়ে এল। দাঁড়িয়ে রইলো লাঠি হাতে দুয়ারের সামনে।

কিছুক্ষণ বাদে দুয়ার খোলা হোলো।

বিজয় ঢুকতে গেল ঠাকুর ঘরে। পুরুৎ ঠাকুর ঢুকতে দিলেন না।

সে কি! পৈতে হয়নি এখনও! ঠাকুর ঘরে ঢুকবি! খবরদার বলছি। ঢুকিস্ নি।

ঢুকতেই যখন পারলো না, তখন রাগে গর গর করতে লাগলো। কিছুই খেলো না। জলস্পর্শও কোরলো না। কত সাধ্য-সাধনা! কেউ খাওয়াতে পারলো না। দাঁড়িয়েই রইলো সেখানে, ঠিক সেইভাবে।

এলেন মা।

খাবি নে?

বিজয় কথা কইলো না।

শ্যামসুন্দরকে সাজা না দিয়ে সে জলস্পর্শও কোরবে না।

মা কত বললেন, কিছুতেই কিছু হোলো না।

বিজয় এক পা-ও নড়লো না।

খিধে পেলে আপনিই খাবে। এই ব'লে ঘরে ভাত ঢেকে রেখে মা শুয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ বাদে ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাত্রি হোলো। বেশ রাত্রি।

মা ভাবলেন, এতক্ষণ খায়নি। নিশ্চয়ই জোর খিধে পেয়েছে। এবার খাবে।

মা-র আবার সাধ্য-সাধনা।

বিজয় কথা কইলো না। ভাত খাওয়া তো দূরের কথা।

একগুঁয়ে ছেলের সাথে না পেরে মা আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

নিশুতি রাত।

মা-র একবার ঘুম ভাঙ্গলো।

তিনি দেখলেন, বিজয় তখনও কিছু খায় নি। সে ব'সে রয়েছে। ঘাড় বেঁকিয়ে, মুখ ফুলিয়ে। কি দস্যি ছেলে রে, বাবা! খিধেও পায় না! মা আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে মা-র আবার ঘুম ভাঙ্গলো। বিজয় যেন কথা কইছে কার সঙ্গে।

মা উৎকর্ণ হলেন।

যাক্! হার মানলে তো! আর তোমাকে কিছুই বোলবো না। বেঁচে গেলে! নইলে দেখাতাম মজা!

মা কান পেতে রইলেন।

বিজয় বলে কি!

এর মধ্যেই বিজয়ের সুর বদলে গিয়েছে।

ভাই শ্যামসুন্দর, আমি না হয় তোমার পরে রাগ ক'রে কিছুই খাইনি। তাই ব'লে তুমি কেন খেলে না?

স্বর্ণময়ী তো বিস্ময়ে হতবাক্! মুখ দিয়ে কথা বেরুতে চাইছে না। শ্বাস পড়ছে না যেন।

বেশ! এসো! তা হ'লে দুইজনে একসঙ্গেই খাই।

এইবার বিজয় খেতে বসলো!

মুখে ফুটে উঠলো প্রসন্নতার হাসি।

দুই সঙ্গী-তে কি এক সঙ্গে খেতে বসলো? বিজয় আর শ্যামসুন্দর?

এই বিজয়। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

দিন যায়। বিজয়কৃষ্ণ এখন যুবক।

বেশ কিছু দিন আগে থেকেই তাঁর জীবনে জেগেছে এক উদগ্র আকাঙ্ক্ষা। ঈশ্বর লাভ করতে হবে। প্রত্যক্ষ করতে হবে পরম সত্যকে। তিনি লাভ করবেন ব্রহ্মজ্ঞান।

বিজয়কৃষ্ণ সঙ্কল্প করেছেন, এর জন্যে কোনও ত্যাগ, কোনও দুঃখ কষ্ট বরণে তিনি পরাঙ্মুখ হবেন না।

সত্য সাক্ষাতের মহান সাধনায় দুশ্চর তপস্যায় মগ্ন হলেন বিজয়কৃষ্ণ।

গুরুবংশে জন্ম। শিষ্যদের নিয়েই এঁদের চলাফেরা। পিতা আনন্দকিশোরও শিষ্যদের নিয়ে দিন কাটিয়েছেন। এই ছিল তাঁর জীবিকার প্রধান উপায়।

অল্প বয়সে বিজয়কৃষ্ণের পিতৃবিয়োগ হয়। তাই অল্প বয়সেই গুরুগিরি তাঁর উপর ন্যস্ত হোলো।

রংপুর জেলায় কোনও এক শিষ্য বাড়ীতে গিয়েছেন বিজয়কৃষ্ণ। আছেন সেখানে।

হঠাৎ কানে এলো দৈববাণী:

কে যেন তাঁকে বলছেন, বিজয় পরলোক চিন্তা কর।

কে বললেন এই কথা? কে তাঁকে দিলেন এই উপদেশ? করলেন সতর্ক? তাঁকে নোতুন পথে চলবার ইশারা দিচ্ছেন কে? কে?

সারা অন্তর মথিত ক'রে জেগে উঠলো আলোড়ন। কি কর্ত্তব্য কিছুই যেন আর বুঝতে পারেন না। ব্যাকুলতা বেড়েই চলে।

একদিন সংসার জ্বালায় জর্জ্জরিত এক বৃদ্ধা শিষ্যা বিজয়কৃষ্ণের দুই

পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। আকুলকণ্ঠে জানালেন আর্তি, প্রভু, আমি ত্রিতাপে জ্বলে পুড়ে মরছি। আপনি আমাকে কৃপা ক'রে উদ্ধার করুন।

কী সর্বনাশ! শিউরে ওঠেন বিজয়কৃষ্ণ।

আমি উদ্ধার করবো এঁকে। এ কি অসম্ভব কথা।

আমি নিজেই যে মায়াজালে জড়িয়ে রয়েছি। আশ্রয় নেই, নেই সহায় সম্বল। আমি কার জন্যে কি করতে পারি? যদি কিছু করতেই না পারি তবে কেন এই গুরুগিরি? কেন এই কপটাচার?

সেইদিন থেকেই গুরুগিরি ছাড়লেন। সংস্কৃত কলেজে পড়তেন তা-ও ছেড়ে দিলেন।

অল্প বয়সে—মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে বিবাহ করেছেন বিজয়কৃষ্ণ।

সংসার চিন্তা উপেক্ষা করা চলে না।

মাঝে এক বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় সর্বস্বান্ত হলেন। পড়লেন চরম অর্থসঙ্কটে। এক একদিন রাস্তার কলের জল বা রাস্তার পাশের কাঁটা নটে শাক খেয়ে দিন কাটাতে হয়।

অন্তরে চলেছে সত্যকে লাভ করবার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। বাইরে দারিদ্র্যের এই নির্মম কষাঘাত।

বিজয়কৃষ্ণের সে এক চরম পরীক্ষা।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন তিনি এলেন কলকাতার ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে। সৌম্যকান্তি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদীতে উপবিষ্ট থেকে সবাইকে ধর্ম উপদেশ দিচ্ছেন।

কী অন্তরস্পর্শী কথা তাঁর।

বিজয়কৃষ্ণ মুগ্ধ হলেন। সান্ত্বনা পেলেন। দীক্ষা নিলেন ব্রাহ্মসমাজে।

অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের একজন শ্রেষ্ঠ কর্মীরূপে খ্যাতিলাভ করলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সবাই তাঁর কর্মক্ষমতায়, চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ হলেন।

সত্যসন্ধ আদর্শনিষ্ঠ পুরুষ বিজয়কৃষ্ণ!

একদিন সোজা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে বললেন, আচ্ছা, যদি আমরা জাতিভেদই না মানি, তবে আর উপবীত রাখা কেন? একি কপটাচার নয়?

সঙ্গে সঙ্গেই উপবীত ত্যাগ করলেন বিজয়কৃষ্ণ! সর্বত্র তুমুল আলোড়ন সুরু হোলো। আত্মীয়স্বজন ব্যথিত হলেন। মা হলেন মর্মাহত। তা হোক্।

সত্যপথের নির্ভীক যাত্রী আর কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই চলেছেন।

সত্যমেব জয়তে। জয় হোক্ সত্যের।

বিজয়কৃষ্ণ সবে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক নিযুক্ত হয়েছেন। একদিন কথায় কথায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বললেন, একটা কথা স্মরণ রেখো, প্রচারের জন্য আমি তোমায় যখন যেখানে যেতে বলবো সেখানেই তোমার যেতে হবে।

তেজস্বী বিজয়কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর করলেন, মার্জনা করবেন, আমি আমার জীবনে ভগবানের আদেশ ও ধর্মবুদ্ধিকেই শুধু অনুসরণ ক'রে চলবো। মানুষের আদেশে চলা তো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। প্রাচীন ও নব্য এই দুই ধারার মধ্যে তীব্র দলাদলি শুরু হয়।

বিজয়কৃষ্ণ বিরক্ত হ'য়ে চ'লে এলেন পৈতৃক বাসভূমি শান্তিপুরে।

শান্তিপুরে থাকা কালে গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরকে নিয়ে একটির পরে একটি ক'রে নানা অলৌকিক ঘটনা ঘটতে লাগলো।

বাল্যের সঙ্গী, খেলার সাথী এই শ্যামসুন্দর। যৌবনে বহুদিন

যাবত বিজয়কৃষ্ণ ঘরছাড়া, শান্তিপুর ছাড়া। বহুদিন শ্যামসুন্দরের সঙ্গে নেই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। শুধু তাই নয়। তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছেন। ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস হারিয়েছেন। এখন সব কিছুই বিচার ও যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রে দেখেন।

তা হোক্।

বিজয়কৃষ্ণের 'পরে শ্যামসুন্দরের টান কিন্তু কমলো না। বেড়েই চললো।

কেমন যেন উদ্ভ্রান্ত হ'য়ে পড়েন বিজয়কৃষ্ণ।

কখনও স্বপ্নে. কখনও বা জাগ্রত অবস্থাতেই শ্যামসুন্দর বিজয়ের কাছে কত আবদার করতে লাগলেন। কত নির্দেশ দিতে শুরু করলেন।

বিজয়কৃষ্ণ দেখেন। পরিষ্কার দেখেন, শ্যামসুন্দর তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, চলাফেরা করছেন, কথা কইছেন। ঠিক যে যে বেশে ভূষায় শ্যামসুন্দর মন্দিরে থাকেন. ঠিক তেমনি বেশভূষায় সজ্জিত হ'য়ে তিনি দেখা দেন অবিকল ঠিক তেমনি রূপটি ধ'রে। কে বলবে, শ্যামসুন্দর একটি বিগ্রহ?

বিজয়কৃষ্ণ ভাবেন। তিনি বিচারে বসেন।

হোন না কেন তিনি অদ্বৈত বংশোদ্ভব গোস্বামীপাদ। এই সব অলৌকিক কাণ্ডের বিচার করতে গিয়ে দিশা হারিয়ে ফেলেন। কিনারা মেলে না।

উদ্ভ্রান্তি বেড়েই চলে।

শ্যামসুন্দর কিন্তু দিন দিন আরও বেশী ক'রে বিজয়কৃষ্ণের প্রেমে বাঁধা পড়তে লাগলেন। অন্তরঙ্গতা বাড়তেই থাকে।

সোজা পাত্রটি তো নন শ্যামসুন্দর!

ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণকে রঙ্গলাল রঙ্গরসে ডুবিয়ে নাচাতে থাকেন।

একদিন শ্যামসুন্দর এসে বিজয়কৃষ্ণকে বললেন, আমি সোনার চূড়ো পরবো। আমাকে একটা চূড়ো পরিয়ে দাও না।

বিজয়কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন, আমি তোমাকে বিশ্বাস টিশ্বাস করি নে। যারা করে, তাদের গিয়ে বল। তা' ছাড়া, আমি টাকা কোথায় পাবো?

ছাখ, তোমার খুড়ীমা-কে বল গিয়ে। তাঁর ঝাঁপির ভিতরে টাকা আছে। তাই নিয়ে চূড়ো গড়িয়ে দাও।

বিজয়কৃষ্ণ গেলেন খুড়ীমার কাছে। বললেন সব কথা।

খুড়ীমা তো অবাক!

ওরে, কাল যে শ্যামসুন্দর এসে আমায় স্বপ্নে বললেন, আমায় চূড়ো গড়িয়ে দাও না। আমি বললাম, ঠাকুর, কোথায় টাকা পাবো? আমার তো কিছুই নেই। শ্যামসুন্দর বললেন, ওগো, চল্লিশ পঞ্চাশটা টাকাও কি তুমি দিতে পার না? ছাখ না। যদি না-ই পার, বিজয়কে বল গিয়ে। সে দেবে।

খুড়ীমা এই কথা ব'লে বিজয়কৃষ্ণের কাছে খুব কাঁদতে লাগলেন। বললেন, বিজয় সাতষট্টি টাকা আমি অতি গোপনে লুকিয়ে রেখেছিলাম। তা' কেউ জানে না।

খুড়ীমা ওই টাকা দিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ সেই টাকা দিয়ে সোনার চূড়ো গড়িয়ে দিলেন। শ্যামসুন্দর সেই চূড়ো পরলেন।

সন্ধ্যার দিকে বিজয়কৃষ্ণ ছাতে পায়চারি করছেন।

শ্যামসুন্দর উঁকি মেরে দেখলেন, ছাতে আর কেউ নেই। তিনি এলেন। বিজয়কৃষ্ণকে বললেন,

ওগো, একবার দেখে যাও না। চূড়ো প'রে আমি কেমন সেজেছি।

বিজয়কৃষ্ণ বললেন, আমি আর এসব কি দেখবো। আমি তো আর এ-সব মানিনে।

শ্যামসুন্দর বললেন, তাতে আর কি! না-ই বা মানলে! একবার দেখতেও কি দোষ!

বিজয়কৃষ্ণ গেলেন। দেখলেন শ্যামসুন্দরকে। সে কী স্নেহমাখা দৃষ্টি! সে কী উজ্জ্বল রূপের ছটা! বিজয়কৃষ্ণ মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

রসিকশেখর তখুনি টিপ্পনি কাটলেন,

এ কি, তুমি না আমাকে বিশ্বাস করো না!

বিজয়কৃষ্ণ বললেন, ঠাকুর, আমার উপর যদি তোমার এতই দয়া তবে আর এত কাল এত ঘুরোলে কেন? সমস্ত ভাঙিয়ে চুরিয়ে কেন আমাকে বিষম কালাপাহাড় করেছিলে?

শ্যামসুন্দর বললেন তাতে আর কি হয়েছে? ভেঙ্গেছিলাম আমি, আবার গড়েও নিচ্ছি আমি। তোমার তাতে আর কি হয়েছে? ভেঙ্গে গড়লে আরও কত সুন্দর হয় জানো?

আর একদিনের কথা।

বিজয়কৃষ্ণ তাঁর মা-কে দেখতে শান্তিপুরে এসেছেন।

একদিন তিনি তাঁর ঘরে ব'সে আছেন।

গুটি গুটি পা পা ক'রে শ্যামসুন্দর দিব্যি সেখানে চ'লে এলেন। বললেন

দ্যাখ, আজ আমাকে এরা খাবার দিয়েছে। জল দেয় নি।

বিজয়কৃষ্ণ তখুনি খুড়ীমা-কে ডেকে বললেন, খুড়ীমা, তোমাদের শ্যামসুন্দর বলছেন, আজ তোমরা তাঁকে জল দাও নি।

খুড়ীমা বললেন, হ্যাঁ, শ্যামসুন্দর আর লোক খুঁজে পেলেন না। তুই ব্রহ্মজ্ঞানী কিনা, তাই তোকে গিয়ে বলেছেন, জল দেয় নি।

আচ্ছা খুড়ীমা, অনুসন্ধান ক'রে দেখই না।

খুড়ীমা খোঁজ নিলেন।

হ্যাঁ, সত্যিই জল দেওয়া হয়নি।

এই রকম কত কথাই না হোতো বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে। পূজারী কোনও প্রকার অনাচার বা ত্রুটি করলে শ্যামসুন্দর এসে বিজয়কৃষ্ণকে জানিয়ে যেতেন।

পরিণত বয়সে বিজয়কৃষ্ণ বলতেন, শিশুকাল থেকেই তিনি শ্যামসুন্দরের আশ্চর্য কৃপা প্রত্যক্ষ করছেন। যখন বুঝতেন না এ-সব কিছু—তখনও। যখন ঠাকুর মানতেন না—তখনও। যখন মেনেছেন —তখনও।

কিন্তু একদিনের কথা বিজয়কৃষ্ণ কোনও দিনই ভোলেন নি। ভুলবার কথাও নয়।

রাত্রিবেলা। শুয়ে রয়েছেন নিজের ঘরে শান্তিপুরে। এমন সময়ে শ্যামসুন্দর এলেন সেখানে। বললেন,

বিজয়, তোমাকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এলাম। আবার তুমি এসে সেই ঘরে ঢুকেছো! ঢুকেছো সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে! বেরিয়ে এসো আগল ভেঙ্গে! বেরিয়ে এসো!

এই কথা ব'লে শ্যামসুন্দর চ'লে গেলেন।

স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন বিজয়কৃষ্ণ। আলোড়ন জাগলো সারা অন্তরে।

আবার ঘরে ঢুকেছো! ঢুকেছো সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে! বেরিয়ে এসো! বেরিয়ে এসো!

হে সর্বমঙ্গলাকর ব্রহ্ম, তুমি তো জানো, সারাটি জীবন চলেছি তোমাকেই ধ্রুবতারা জ্ঞান ক'রে। দ্বিধা, সংশয় তো কখনও রাখিনি মনে।

করুণাঘন হে সত্যসুন্দর, তোমার আদেশই শিরোধার্য করলাম। তাই হবে, প্রভু! তাই হবে! এখন থেকে বিজয় মুক্তাঙ্গনেই বিচরণ করবে।

এই বিজয়কৃষ্ণ—প্রভুপাদ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন, এ দেশের সমাজ-চেতনায় বিজয়কৃষ্ণের অধ্যাত্মজীবনের প্রভাব সুদূর-প্রসারী। এ প্রভাবের গুরুত্ব উপলব্ধি করবার মত সময় আজিও আসে নাই।

জনম জনম প্রভু! দেহ এই দান।
হৃদয়ে রহুক এই কেলি অবিরাম॥

—বৃন্দাবন দাস।

শাশ্বত ভারত লিখতে নিম্নলিখিত বইগুলির উপর নির্ভর করেছি

এইসব অমূল্য গ্রন্থের লেখকগণকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করি।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ

অমিয় নিমাই চরিত—মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম কথিত

শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—অক্ষয় কুমার সেন

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—উদ্বোধন কার্যালয়

পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

সদালাপ—মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়

চিন্ময় বঙ্গ—ক্ষিতি মোহন সেন

বাঙলার দুই ঠাকুর—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

শক্তি সাধনা ও শাক্ত পদাবলী—শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

ভারতের সাধক—শঙ্কর নাথ রায়

সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবি
আজো পড়ে মনে মোর—পড়ে যে কেবলি মনে !
সেই আলোর দুলাল শ্যামলের প্রেম ছবি
আজো পড়ে মনে মোর—পড়ে যে কেবলি মনে !

* * *

ওরা হাসে আজ, বলে ঃ 'হায়রে মধুর স্বপন !'
বলে ঃ 'কৃষ্ণ-কাহিনী—কল্পনা—কবি-কথন !'
(ওরা হাসে—ওরা জানে না—তাই হাসে—
ওরা জানে না—তাই মানে না—
আমি জানি—তাই মানি—
আমি অন্তরে তোমার বাঁশরী শুনেছি,
তাই বঁধু আমি জানি)

তাই এসব কথা তো শোনেনা আমার স্বপন,
ব্রজ- রমণীর কথা—আর সে রমণী-রমণ—
আজো পড়ে মনে মোর—পড়ে যে কেবলি মনে !

—নিশিকান্ত।